সপ্তপঞ্চ

পরিমল গোস্বামী

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী

কল্যাণীয়াসু

বইয়ের নাম রাখা হয় বিষয়বস্তুর চরিত্র-প্রকাশ বাসনায়। এ বইয়ের বিষয়বস্তু এলোমেলো, তাই কোনো একটিমাত্র নামে তাদের কোনোটারই চরিত্র বোঝা যাবে না।—সোজা ভাষায়, রচনাগুলি চরিত্রহীন।

পাঁচমিশেলি রচনার সংকলন এটি। সাতপাঁচ মানেও পাঁচমিশেলি। সাতপাঁচকেই সংস্কৃত ক'রে সপ্তপঞ্চ বানানো গেল, কারণ নামের উপরেই আমার একমাত্র ভরসা।

প্রত্যেকটি রচনার শেষে রচনার বৎসর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ভ্রমক্রমে 'প্রাচীন মানুষের নূতন বিপদ' প্রবন্ধের শেষে ১৯৫৭ ছাপা হয়েছে, ওটি ১৯৫৬ হবে।

কলিকাতা
মে, ১৯৫৭

লেখক

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

মারকে লেঙ্গে

পরিমল গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প

ম্যাজিক লণ্ঠন

পথে পথে

ট্রামের সেই লোকটি

ঘুঘু

সূচী

নানা রঙের দিনগুলি

আমরা যে-কালের ভিতর দিয়ে চলি, তা অত্যন্ত কাছে থাকে ব'লে তাকে আমরা দেখি না। বোধ হয় অব্যবহিত বর্তমানকে সম্পূর্ণ ক'রে দেখতে পাওয়া মনের ধর্মই নয়। তার দুখানি মাত্র পা, অথচ কাল তিনটি, তাই তিনটি কালে সে সমান ভাবে পা ফেলতে পারে না। যদি কেউ পারে তবে জানা যাবে সে ব্যাকরণের পাতা খুলে ব্যাকরণের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে আবদ্ধ হয়ে আছে। ব্যাকরণের বাইরে যে তিনটি কাল, তার উপরে মনের গতি পেণ্ডুলামের গতি। পেণ্ডুলাম তার গতিসীমার দুই প্রান্তে একবার থামে, মধ্যপথে কখনো থামে না।

লিখতে ব'সে প্রথমেই এই কথাগুলো মনে আসছে, কারণ অতীতে যে কয়েকটি বছরের কথা মনে আনতে চেষ্টা করছি, এখন মনে হয় তাদের সম্পূর্ণ ক'রে দেখতে পাচ্ছি। তখন পারি নি।—তখন, অর্থাৎ যে সময় সে কালের মধ্যে বর্তমান ছিলাম।

সে দিনের স্মৃতি মনে রোমাঞ্চ জাগায়। আজকের এই মন ও দৃষ্টি নিয়ে সেই দিনগুলোর মধ্যে ফিরে গিয়ে আজ সেই কালকে একটু আদর ক'রে আসতে ইচ্ছে হয়।

অতীত ও ভবিষ্যৎ কালেই যে মানুষ বেশি বাস করে তার আর একটি প্রমাণ দিয়ে থাকেন গণৎকার। কেউ হাত দেখে', কেউ কোষ্ঠী দেখে', মানুষের অতীত ও ভবিষ্যৎ ব'লে চলেছেন। বর্তমান তাঁর কাছে তুচ্ছ, কারণ বর্তমানের জ্ঞানের উপর কারও দাবি নেই। গণৎকারও তাই সাধারণ মানুষের

মতো দ্বিকালদর্শী। আমিও তাই। ত্রিকালদর্শী হ'লে তো ঋষি হতে পারতাম।

১৯৩৩-৩৪-৩৫-৩৬ সনের সেই দিনগুলি—যা সোনার খাঁচায় রইল না, অথচ যা হারিয়ে যায় নি। কিংবা কে জানে, দূর থেকে হয় তো সোনার খাঁচাটিকেই শুধু দেখছি।

গণৎকার ব'সে আছেন ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটের দোতলার একটি প্রশস্ত ঘরে।

সুরেশ বিশ্বাস। এ কালের কেউ তাঁকে চেনে না, চেনবার উপায়ও নেই, তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে লুপ্ত করেছেন ইহকালের দৃষ্টির আড়ালে।

সুরেশ বিশ্বাস হাতের রেখা দেখছেন। সজনীকান্তের হাত। অতিকায় অতিপুষ্ট আঙুল সম্বলিত হাত।

"আপনার আরও কয়েক বছর গণ্ডগোল আছে—তারপর দিন আসছে উন্নতির—ভীষণ উন্নতি সামনে—কেউ ঠেকাতে পারবে না।"

সজনীকান্ত হয়তো অবিশ্বাসের হাসি হাসছেন মৃদু মৃদু, তবু কথাটা বিশ্বাস করতে ভাল লাগে।

একটু দূরে কিরণ রায় টেবিলে মনোযোগ দিয়ে প্রুফ দেখছেন হট্টগোলের মধ্যে। জনারণ্যে কিরণকুমার একা।

ডক্টর সুশীলকুমার দে হাত এগিয়েছেন সুরেশ বিশ্বাসের দিকে।

"ঢাকার চাকরি ছাড়তে হবে—you will have to fly away from Dacca!"

এখনও সে ধ্বনি কানে বাজছে।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হাত।

"বিলেত যাওয়া আবার ঘটবে অল্পদিনের মধ্যে। নিশ্চয় ঘটবে।"

সাড়ে তিন বছরের ঘটনা, যে কথাটি যখন মনে আসছে পর পর লিখে চলেছি। চলন্ত ছবি। এক-একটি ছবি ঘিরে কত রঙ, তা শুধু আমার মনের মধ্যেই উজ্জ্বল।

অসুখবিলাসী খুঁতখুঁত-ধর্মী প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজের যে-কোনো তুচ্ছ অসুখের কথা নিয়ে কিরণের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক ধ'রে আলাপ চালাচ্ছে। বঙ্গীয় ব্যাধি-সাহিত্য নামক কোনো সাহিত্য-শাখা থাকলে প্রেমেন সে শাখার স্থায়ী সভাপতি হত।

এক পাশে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীরদচন্দ্র চৌধুরী ইংলণ্ডে একটি বিশেষ জাতীয় ফার্ন গাছ আছে কি না তা নিয়ে তুমুল তর্ক বাধিয়েছেন। সামনে ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন একখণ্ড খোলা পড়ে আছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর ক্রমশঃ-প্রকাশিত 'অভিশাপ' উপন্যাসের কিস্তি অতি বিলম্বে এনেছেন। তা নিয়ে কিছু তিক্ত ভাব সৃষ্টি হয়েছে। তিনি অভিশপ্তের মতো ব'সে আছেন নীরবে। পাশে তাঁর অনুচর কবি সুবল মুখোপাধ্যায়, মুখে স্মিত হাসি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিতান্তই তরুণ যুবক, চেহারায় উদাসীন বাউলের ভাব। বেপরোয়া লেখক। লিখছেন প্রচুর। হাতে রেস্-বিজ্ঞান গবেষণার খাতা।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মধুর কণ্ঠে সরস গল্প জমিয়ে তুলেছেন। পরম উপভোগ্য মুহূর্তগুলি উড়ে চলেছে পাখা মেলে।

হ্রস্বদেহ বজ্রকণ্ঠ প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে শিল্পী অরবিন্দ দত্তের তুমুল তর্ক চলছে। এ তর্কের কোনো হেতু নেই। তর্কের জন্যই তর্ক। আর্ট ফর আর্টস সেক।

মোহিতলাল মজুমদার রবীন্দ্রনাথের প্রতি বড়ই ক্ষুব্ধ। তাঁর সমালোচনা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে খেয়াল নেই। বলছেন—খুব দম্ভের সঙ্গে—"রবীন্দ্রনাথ একটি লাইন ইংরেজী লিখতে জানেন না।" এবং আরো কত কি, লেখবার মতো নয়।

তাঁকে সামনে পেলে রক্তপান করেন এই রকম ভাব।

সদাশিব শিব গাঙ্গুলী ইংরেজী টোনে মাঝে মাঝে বক্র কটাক্ষে বলে উঠছেন—"হোয়াটস্ অল দিস ফাস্?"

পাশের ঘরে ঢুকছেন কজন। নলিনীকান্ত সরকারের গান হবে। মাসিকপত্র অফিসে গান! অতএব একটা ঘরে খিল বন্ধ হল। দেহতত্ত্বের গান সব, "A" মার্কা। রচনানৈপুণ্যে পুরস্কার পাবার উপযুক্ত।

বড় ঘরটাতে অন্তত পঁচিশজন ব'সে তর্কবিতর্ক চালাচ্ছেন।

নবাগতের প্রশ্ন—"সজনীবাবু কোথায় ?"

"তিনি বেরিয়ে গেছেন।"

"বড়ই দরকার ছিল।"

"ঘণ্টাখানেক পরে এলে দেখা পাবেন।"

আধ ঘণ্টা পরে পাশের তালাবন্ধ ঘর (গণপতি চক্রবর্তীর ইলিউশন বক্স !) থেকে আর এক দরজার খিল খুলে সজনীকান্তের আবির্ভাব।

বাইরে যান নি তিনি। ওটি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। নইলে ভিড়ের মধ্যে সম্পাদনা বা লেখার কাজে কিছু অসুবিধা হ'ত।

সুরেশ বিশ্বাস গল্প জমিয়ে বসেছেন: "নীরদ চৌধুরী কেমন জানেন ? মস্ত বড় পণ্ডিত। সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন সব জানেন। ভূগোলের জ্ঞান অদ্ভুত। সমস্ত দেশের খবর ইঞ্চি ইঞ্চি হিসেবে ব'লে দিতে পারেন। ইউরোপের কোন্ গ্যালারিতে কোন্ বিখ্যাত ছবি আছে তা ব'লে দিতে পারেন। তবে তাঁর সামান্য একটু ত্রুটি আছে।—তিনি লিলুয়ার বেশি দেশ নিজ চোখে দেখেন নি।"

সুরেশ কম্পোজিটর প্রুফ হাতে ঘোঁত-ঘোঁত করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছেন, "বাবুরা সব লেখক হয়েছেন, একটা বানান ঠিক ক'রে লিখতে শেখেন নি!" ইত্যাদি।

অশোক চট্টোপাধ্যায় এসেছেন। খুড়ুদা তিনি সবার। আড্ডা জমানোয় নোবেল প্রাইজ পাবার উপযুক্ত। রবীন্দ্রকাব্যের নতুন অনুবাদ শোনাচ্ছেন, "ওগো তুমি কোথা যাও—O cow, where do you go." অথবা "যৌবন নিকুঞ্জে In the bowerless jow forest" অথবা "তিমির আড়ালে—Behind the whale."

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অশরীরী, একেবারে শেলীর স্কাইলার্ক, স্থূলত্ব কিছু নেই, সবখানি আবেগ আর উচ্ছ্বাস। সব কাজ তাঁর ইন্‌স্‌পায়ার্ড। সুন্দর কিছু পেলেই গদগদ ভাব। মধুর কণ্ঠ, গীতধর্মী সুর, সেই সুরের কাছে সত্য মিথ্যা সব একাকার। অবিন্যস্ত চুল। দেখলেই মনে হয় দুনিয়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে— এই খবরটি তাঁর মুখে এখুনি শুনতে পাব।

ঘোর গরম, পাখার হাওয়া তুচ্ছ মনে হচ্ছে। এমনি সময় পাখা বন্ধ ক'রে দিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি সিগারেট যোগাড় করেছেন, খেতে হবে আরাম ক'রে। পাখার হাওয়ায় অকারণ বেশি পুড়ে যায়। তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠ। অবিচলিত, আত্মস্থ, আপন বিনয়ে সচেতনতাহীন। গ্রাম্য বালক যেন। উত্তেজনাহীন, রাগদ্বেষহীন।

বিভূতিবাবু বলছেন ব্যবসা করবেন। তার ফলে এক তুমুল কাণ্ড ঘটে গেল। দশ বারোজনে মিলে তাঁকে ব্যবসার প্ল্যান দিতে লাগলাম। প্রত্যেকটি প্ল্যান সর্বোৎকৃষ্ট। এই ঘটনাকে একটু প্রলম্বিত ক'রে "প্ল্যান" গল্পটি লিখেছিলাম। সেটি 'বঙ্গশ্রী' জ্যৈষ্ঠ (১৩৪০) সংখ্যায় ছেপেছিলেন সজনীকান্ত।

এর বছর দুই আগে যখন এই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হই নি, তখন হ্যারিসন রোডের ট্রামে যেতে এক নকল রবি ঠাকুরকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলাম তাঁর দিকে। গায়ের রঙ ফরসা হ'লে আসল ব'লে ভুল হত।

চেহারাটা মনে রেখেছিলাম, মনে রাখবার মতো ব'লে।

সেই নকল রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম এই 'বঙ্গশ্রী'র আসরে। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। লেখেন, ছবি আঁকেন, অভিনয় করেন।

ইতিপূর্বে বাইরে যাঁকে সামান্য চিনেছি, একে একে সবাইকে দেখি 'বঙ্গশ্রী'র আসরে।

রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে শনিরঞ্জন প্রেসের টাইপ-ঘরের বিপরীত ঘরে আমি নিজে যখন ১৮-পয়েণ্ট কম্‌প্রেস্‌ড টাইপের মতো বাস করছি, তখন এক ব্যক্তির সঙ্গে

ঘটনাসূত্রে আলাপ হয়। হ্রস্বদেহ, গম্ভীর মানুষ। বাড়িতে দেহচর্চা করেন। লোহার রিঙ ঝোলানো আছে কড়িকাঠে। কারলাইলের গোঁড়া ভক্ত, তাঁর ছবি ঝুলছে ঘরে।—নিখিলচন্দ্র দাস।

কিছুদিন আগে ভাগলপুর থেকে বনফুলের কয়েকটি ছন্দে লেখা গল্প সংগ্রহ করে এনেছি। "জনার্দন জোয়ার্দার" ছাপা হবে 'শনিবারের চিঠি'তে। তাঁকে পড়ে শোনাচ্ছি। গম্ভীর লোকের উপর কৌতুক কাহিনীর কি প্রতিক্রিয়া হবে জানতাম না।

স্যুট-পরা নিখিলচন্দ্র দাস গল্পের শেষ অংশ শুনে মেঝেতে গড়াতে লাগলেন। সে কি দৃশ্য! আমি তো স্তম্ভিত।

তার পরদিন আবার এসেছেন।

"ঐ কবিতাটার শেষ কটা লাইন আবার পড়ুন তো।" আমি আবার পড়লাম।

পুত্র জনপ্রিয় জনার্দনকে ধ'রে পিতা গর্জন করছেন আর মারছেন। প্রচুর মার খেয়ে—

"স্কিপ ক'রে
জনার্দন প্রণম্য পিতায়
সার্কাসি কায়দায়
স্যালিউট করি
গেল সরি।"

আবার নিখিলচন্দ্র দাসের কোট-প্যাণ্টের ভাঁজ ভাঙল, ধুলোমাখা হলেন আপাদমস্তক।

তাঁকেও দেখলাম 'বঙ্গশ্রী' অফিসে, প্রথমে গম্ভীর মূর্তিতে, পরে মার মূর্তিতে; হাসিয়ে দিলে আর রক্ষা ছিল না। নলিনীকান্ত সরকার ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র থাকলে সেদিন রক্তপাত হত।

কিছুদিন পরে এবং কিছুদিনের জন্য তিনি ও সজনীকান্ত পরস্পর সুখ-দুঃখের ভাগী হলেন।

শিল্পী যামিনী রায় এসে বসেছেন। ব্যাখ্যা করছেন তাঁর আপন শিল্পভঙ্গি। শিল্পী অতুল বসু, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, হরিপদ রায় আসছেন নিয়মিত।

বনফুল সিনেমা দেখে জ্যানেট গেনরকে উদ্দেশ ক'রে কবিতা লিখে টেলিফোনে শোনাচ্ছে কিরণকুমারকে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছে মুঙ্গের থেকে। আলাপ হ'ল তার সঙ্গে। আবিষ্কার করলাম পনেরো বছর আগে আমরা একই কলেজে একই ক্লাসে এবং সেকশনে পড়েছি। কেউ কাউকে চিনতাম না, 'বঙ্গশ্রী' অফিসে বসে পরিচয় হ'ল। কেউ কাউকে কখনো দেখেছি বলেও মনে হ'ল না।

ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী আবৃত্তি শোনাচ্ছেন সবাইকে অবাক ক'রে। স্মৃতি এবং কণ্ঠ দুইই চমকপ্রদ। অপরের ফুসফুস নিয়ে কারবার, কিন্তু তাঁর নিজের অন্তরটা আর সবারই কাছে উন্মুক্ত থাকত।

ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য আসতেন কদাচিৎ। সব রকম বিষয়ে লেখায় ওস্তাদ। আর আসতেন বিজ্ঞানী গোপাল ভট্টাচার্য, উকিল জ্ঞান রায়, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ কবি জগদীশ ভট্টাচার্য, বাসবেন্দ্র ঠাকুর, ঝুনোকবি কৃষ্ণধন দে।

কবি হেমচন্দ্র বাগচী শান্ত মধুর ভাবে এসে বসতেন। প্রকাণ্ড ব্যাগে গান্ধীজি, উড়িষ্যার মন্দির এবং অসহযোগ আন্দোলনকে পুরে নির্মলকুমার বসু আসতেন প্রসন্ন হাসিমুখে।

সকল বিষয়ে সকল বিধিনিষেধভঙ্গকারী সজনীকান্ত খামখেয়ালিতে সবাইকে হার মানাতেন। দল ধ'রে হঠাৎ অফিসের সময় ডায়মণ্ড হারবার যেতে হবে। সজনীকান্ত সহকারী কিরণকে বলছেন, "সঙ্গে না গেলে চাকরি খেয়ে দেব।"

শিক্ষক মনোজ বসু, 'নবশক্তি' সম্পাদক সরোজকুমার রায়চৌধুরী, কর্মযোগী যোগানন্দ দাস, দুর্ধর্ষ গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-কলহপ্রিয় গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—সবাই আসছেন, যাঁর যখন খুশি। চলচ্চিত্রের মতো নিজ নিজ ভূমিকা অভিনয় ক'রে চলে যাচ্ছেন।

আশ্চর্য আড্ডা। লেখক, শিল্পী, শিল্প-রসিক, সাহিত্য-রসিক—যাঁরই দুখানা পা সচল, তাঁকেই দেখা যাচ্ছে সেখানে। বেলা একটা থেকে ভিড় জমছে। সংখ্যা বাড়ছে ক্রমে। ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ, সুকুমার সেনকে দেখা যাচ্ছে বিকেলের দিকে, কখনো দুপুরে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তখনও আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত নন, কিন্তু সজনীর উৎসাহে সৃজনী উৎস খুলছে আশ্চর্য দ্রুত।

সজনীকান্তের গুণগ্রহণের ভাষা ছিল "ওয়াণ্ডারফুল!" যা শুনতেন, সব ওয়াণ্ডারফুল। এ জন্য কোনো কোনো লেখকের অধঃপতন ঘটেছে সন্দেহ নেই, সময়কালে অপ্রিয় সত্য বললে হয়তো লেখকের উপকার হত। কিন্তু তবু বলব ওই 'ওয়াণ্ডারফুল' কথাটি পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়েছিল ব'লে আজও অনেকে সাহিত্যের পথে চলেছেন আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে।

সজনী-কেন্দ্রিক 'বঙ্গশ্রী'কে ঘিরে কি বিচিত্র ভিড়, কি বিচিত্র সম্ভাবনা।

সজনীকান্তের চরিত্র ছিল রহস্যময়। তিনি কখনো তাঁর শেষ দেখতে দিতেন না। প্রতি পদে বিস্মিত হয়েছি। অনেক সময় ইচ্ছে ক'রে রহস্য বাড়াতেন। অনেক জটিল সমস্যার কি ক'রে যে সহজ সমাধান খুঁজে পেতেন তা আজও জানি না।

সেদিনের আড্ডায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা স্বীকার করবেন, একটি চরিত্রের এই রহস্যময় বৈচিত্র্যই সেদিনের ছিল সর্বপ্রধান আকর্ষণ। ভাল লেগেছিল সে বৈচিত্র্য।

ভীরুতা দেখি নি কখনো।

অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা দেখি নি কখনো, তা সে নিজের জন্যই হোক বা আশ্রিতের জন্যই হোক।

'বঙ্গশ্রী' থেকে সরে যাবার বেলাতেও সেই অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়া। অথচ সম্পাদক সজনীকান্ত 'বঙ্গশ্রী' সম্পাদনায় চরম যোগ্যতাই দেখিয়েছিলেন। 'বঙ্গশ্রী' প্রথম শ্রেণীর কাগজ হয়েছিল। সম্পাদনার আঙ্গিক বা কৌশল বিষয়ে আমি তো তাঁর কাছে প্রায় সবটাই ঋণী।

এই 'বঙ্গশ্রী'কে কেন্দ্র ক'রে যে শক্তি গড়ে উঠেছিল তার ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে আজ কি হত বলা যায় না। 'বঙ্গশ্রী' খুব বড় কাগজ হত অবশ্যই, কিন্তু সুরেশ বিশ্বাসের ভবিষ্যদ্বাণী যে ফলতে পারত না তাতে সন্দেহ নেই।

আঠারো বছর হ'ল 'বঙ্গশ্রী'র কাল গত হয়েছে। তখন যে সব পুত্র জামাতা পিতা সেখানে একত্র হয়েছিলেন, এখন তাঁদের প্রায় সবাই পিতা শ্বশুর বা পিতামহের স্থান নিয়েছেন। কেউ কেউ এ-কালের বাইরে চলে গেছেন। শুধু স্মৃতির মধ্যে সেই দিনগুলি আজ বেশি উজ্জ্বল, বেশি রোমাঞ্চকর।

(শনিবারের চিঠি, পূজা-সংখ্যা ১৯৫৫)

হাস্যকৌতুক প্রসঙ্গে

হাস্য-কৌতুকের উপাদান প্রধানত মানুষের জীবন। জীবন অর্থে মানুষের চরিত্র ও তার ব্যাবহারিক জীবন। মানুষের জীবন হাস্যকর হল কেন, এ প্রশ্নের উত্তর বহুকাল থেকে খোঁজা হচ্ছে, কিন্তু জীবনকে যেমন ব্যাখ্যা করা যায় না, জীবন কেন হাস্যকর তারও তেমনি ব্যাখ্যা করা যায় না। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, জীবনটাই কি তবে একটি ব্যঙ্গ? একটি হাসির ব্যাপার?

একটি মানুষের বহু পরিচয়। ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত এবং তা ছাড়াও বহু। স্বসীমার মধ্যে সব পরিচয়ই সত্য। কোনো একটি পরিচয় তার শেষ পরিচয় নয়।

এই বিভিন্ন পরিচয়ের কথা আমরা জানলেও এর জন্য আমরা সব সময় প্রস্তুত থাকি না। সেজন্য এক পরিচয় থেকে আর এক পরিচয়ে পৌঁছলে আমরা হঠাৎ চমকে উঠি। যে মানুষটি সূক্ষ্ম যুক্তিজাল বিস্তার ক'রে স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষে বক্তৃতা দিয়ে এলো সেই মানুষ যদি ঘরে ফিরে তার স্ত্রীকে বাইরে যাবার জন্য ধ'রে মারে, তা হলে আমরা হঠাৎ এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাই না। কাজটা অসঙ্গত মনে হয়, চিন্তাধারা আঘাত খেয়ে সাময়িক ভাবে তার দায়িত্ব হারিয়ে ফেলে। এমনি অবস্থা হাসির অনুকূল।

আমাদের মন যে ছবিটি দেখছে সেটাকে তড়িৎগতিতে সরিয়ে তার জায়গায় আর একটি ছবি দেখতে সে অভ্যস্ত নয়। মনের এক কুঠুরিতে প্লাগ লাগিয়ে আলো জ্বালানো হয়েছে, চট করে সে প্লাগ খুলে অন্য কুঠুরিতে লাগানোয় অভ্যস্ত নয়। এর জন্য বেশ খানিকটা সময় চাই, নইলে আচম্বিতে সে ঐ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না; আর এই জন্যই মন সাময়িক ভাবে রুদ্ধগতি হয়ে ডিগবাজি খায়, একটু নেচে নেয়।

কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করা দরকার। একটি মানুষের চরিত্রে সর্বদা যে সমধর্মিতা বা অবিরোধিতা আমরা আশা করি, তা তার চরিত্রে সত্যিই নেই।

অথচ আমরা জানি, আমরা নিজেরা কথায় কাজে সকল ক্ষেত্রে এক থাকতে পারি না। সামাজিক ক্ষেত্রে যেটি নিজের মত ব'লে প্রচার করি, ব্যক্তিগত জীবনে তার বিরোধিতা করি। সামাজিক ভাবে যে যুক্তিবাদী, নিজের বেলায় সে অযৌক্তিক। চা-পান না বিষপানের প্রচারক নিজে চা খান। স্ত্রীস্বাধীনতার সমর্থনকারী নিজের স্ত্রীকে আবদ্ধ রাখেন।

এটি বুঝিয়ে দিলেই আমরা বুঝি। এই পরস্পর বিরোধিতা মানুষের বৈশিষ্ট্য এটি জানা সত্ত্বেও আমাদের মনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অভ্যাসের দাস হওয়া।

ঘুষ নেওয়ার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণকে ঘুষ নেওয়ার বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রে তুলছে যে লোকটি, সেই লোকটি ঘুষ খেয়ে বক্তৃতা থামিয়ে দিতে পারে—এ দুর্বলতা মানুষের আছে; কিন্তু আমরা যখন তার বক্তৃতা শুনছি, তখন আমাদের মন আপনা থেকেই মেনে নিয়েছে যে, লোকটা নিজে খুব সৎ। এমন অবস্থায় তাকে ঘুষ নিতে দেখলে মন আছাড় খেয়ে পড়ে। অতি শ্রদ্ধেয় ধর্মগুরু যদি রাত্রে সিঁদ কেটে বেড়ান তা হলে তা দেখেও মন ধাক্কা খায়।

একটি লোক যে দুই-ই হতে পারে এটি যুক্তির মানা, অভ্যাসের মানা নয়। তাই একটি মানলে অন্যটা অসঙ্গত মনে হয়। এই অসঙ্গতি অনেক সময় আমাদের আদর্শ নয় ব'লে, এগুলিকে ব্যঙ্গ-কৌতুকের বিষয় করি—মানুষকে এই অবাঞ্ছিত অসঙ্গতি থেকে মুক্ত করতে। অসঙ্গতিকে অতিরঞ্জিত ক'রে লোককে হাসিয়ে দিতে পারলে অনেক সময় দ্রুত ফল পাওয়া যায়।

অপ্রত্যাশিত বা অসম্ভবকে হঠাৎ দেখলে মনের চিন্তাধারা ডিগবাজি খায় আগেই বলেছি। মন যেন একটা আবর্তের মধ্যে প'ড়ে যায়। এবং এতে যদি তার নিজের স্বার্থ জড়িত না থাকে তবে সে হাসতে থাকে। নিজের স্বার্থ জড়িত থাকলেও আচমকা আঘাতে অনেক সময় লোকে হাসে। মার খেতে খেতেও, ভুল লোককে মারা হচ্ছে ব'লে যে লোকটি হাসতে পারে, তার কথা আমরা জানি।

শুধু অসঙ্গতি নয়, অসম্ভবও যদি আচমকা ঘটে, তা হলে লোকে অনেক সময় বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। এ অবস্থাও হাসির অনুকূল! বিলেতের এক কৌতুক অভিনেতা এক ছোট্ট মাথার খুলি বের ক'রে গম্ভীর ভাবে বলতেন, এটি কবি বার্নস-এর বালককালের খুলি।

ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু বোঝা যায় মন হঠাৎ আহত হলে হাসে। আঘাত নানা ভাবে আসতে পারে—অতিরঞ্জনের আঘাত, সোজাকে উল্‌টিয়ে দেখানোর আঘাত, অসঙ্গতি ও অসম্ভাব্যের আঘাত।

এটি মনের ধর্ম। মাঝে মাঝে তার বিরাম চাই। কাজের ও চিন্তার চাপের চাবিটি ঘোরাতে ঘোরাতে মনের স্প্রিং কেটে যাবার মতো হয়, তখন স্প্রিংটি ঢিলে ক'রে দিতে হয় উল্টো দিকে ঘুরিয়ে।

সেই বুড়ো ঘোড়ার গল্পটা। চুনের ভাঁটিতে তাকে সপ্তাহে ছ'দিন জোয়াল কাঁধে ক্রমাগত ঘুরতে হত, এক দিন ছিল তার ছুটি। সেদিন সে নির্দিষ্ট সময়ে স্বাধীনভাবে সেখানে গিয়ে উল্টো দিকে ঘুরত। এতে সে ছুটির আরাম পেত।

হাসি আমাদের মনকে ঠিক এই ভাবে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেয়। তবে হাসিরও বোধ হয় একটা সীমা আছে। অগস্ট মাসে কাইরোর এক খবরে পড়েছিলাম একটি লোক হাসতে হাসতে মরে গেছে। এ রকম হাসি নিশ্চিত কিছু বাড়াবাড়ি। অন্যথায় কৌতুক হাস্য সত্যিই স্বাস্থ্যকর।

ইংরেজীতে উইট ও হিউমারের শ্রেণীবিভাগ আছে। এ প্রবন্ধে শ্রেণী-বিভাগ ও তার সংজ্ঞা নির্ণয় আমার আদৌ প্রধান লক্ষ্য নয়, আমি হাস্য পরিহাসের মূল কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করছি মাত্র। একদিকে বুদ্ধির খেলা; অপরদিকে জীবনের যাবতীয় দুঃখদুর্দশা নির্বুদ্ধিতা ও অসঙ্গতি।

সরল মানুষের জীবন থেকে উৎকৃষ্ট হাস্যরস পেয়েছি আমরা। এক নিগ্রো অফিসে যেতে ঘণ্টাখানেক দেরি করেছিল। সে তার দেরির জন্য কৈফিয়ৎ দিয়েছিল এই ভাবে—"আমি রোজ অফিসে আসবার সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বাঁধি। আজ যথাসময়ে আয়নার সামনে গিয়ে দেখি আমাকে

দেখা যায় না। তখন মনে হল আমি অফিসে চলে গিয়েছি। তারপর হঠাৎ শুনলাম আয়নাটা ফ্রেম থেকে খুলে মেরামতের জন্য দোকানে দেওয়া হয়েছে।"

আর একটি কাহিনী। অরণ্যে কাঠুরেদের দূরে দূরে অবস্থিত ক্যাবিন। একটি ক্যাবিনের দরজায় আঘাত পড়ল। ভিতর থেকে কাঠুরে বেরিয়ে এলো। এসে দেখে দু'জন কাঠুরে দরজায় দাঁড়িয়ে। তারা বলল, "তোমার মতো দেখতে একটি লোক দূরে ঐখানটায় ম'রে প'ড়ে আছে দেখে খোঁজ নিতে এলাম তুমি কি না।"

কাঠুরে বলল, "তার গায়ে কি ধূসর রঙের শার্ট?"

আগন্তুকেরা বলল, "না শাদা।"

কাঠুরে বলল, "তা হলে আমি নই।"—ব'লে দরজা বন্ধ করে দিল।

স্থায়ী ট্র্যাজেডি বা ভাগ্যের পরিহাসের উপর ভিত্তি ক'রে যে সব হাস্যরসের সৃষ্টি, তা আমাদের মনে স্থায়ী আসন পাতে। সমস্ত মানবতার দুঃখ বেদনা, বঞ্চিতের হাহাকার যেন তার মধ্যে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। অথচ না হেসে পারা যায় না।

একটি লোকের একটি হাঁস ছিল, হাঁসটিকে সে নানারকম খেলা শিখিয়েছিল, কিন্তু লোকটি ছিল বড়ই গরিব। সে এক ভ্রাম্যমান নাট্য সম্প্রদায়ের ম্যানেজারের কাছে গিয়ে বলল, "আমাকে একটা চাকরি দাও, তোমাদের অভিনয়েব বিরাম সময়ে এই হাঁসের খেলা দেখাব।" ম্যানেজার পাখীটির খেলা দেখে খুব খুশি হলেন। বললেন, "তোমাকে খবর দেব, ঠিকানা দাও।" একমাস পরে টেলিগ্রাম এলো, "তোমার হাঁস নিয়ে চলে এসো, কবে আসবে জানাও।" ম্যানেজার উত্তর দেবার খরচ আগাম জমা দিয়ে প্রি-পেড টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন।

লোকটি উত্তরে জানাল, "বড়ই দুঃখিত, দেরি হয়ে গেছে, হাঁসটিকে খেয়ে ফেলেছি।"

হাসির সঙ্গে অশ্রু ওতপ্রোত। চার্লি চ্যাপলিনের হাস্যরস এই জাতীয়। সেও বঞ্চিত মানবতার ছবি। তাই তিনি পৃথিবীর এক জন শ্রেষ্ঠ মানব।

বঞ্চনা সকল মানুষেরই আছে কোনো না কোনো দিকে। চার্লি সকল বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধি। তাঁর ভিতর দিয়ে আমরা সংসারের ছবি দেখতে পাই। না হেসে পারি না, কিন্তু মনের চোখ জলে ভরে ওঠে। যে-হতভাগ্য জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত, ছোট-খাটো আনন্দও তার জীবনে কি প্রতিক্রিয়া ঘটায়, তা আমার মতে চার্লির মতো আর কোনো শিল্পী দেখাতে পারেন নি। 'গোল্ড রাশ' ছবিতে জর্জিয়া হেল-এর নিমন্ত্রণে আশাতীত আনন্দের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আশ্রয়দাতার ঘরের বালিশ ছেঁড়া, আসবাবপত্র ভাঙার কথা, অনেকের মনে আছে আশা করি।

'সিটি লাইটস'-এর প্রথম দিকে একটি ব্যঙ্গ আছে অতিজোরালো। কোটিপতিকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচিয়ে চালচুলোহীন পথের ভিখিরি তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে—"Tomorrow the birds will sing" অর্থাৎ কোনো চিন্তা নেই, কাল সব ঠিক হয়ে যাবে। দুর্ভাগ্যের প্রতি এর চেয়ে বড় শ্লেষ ও করুণ ব্যঙ্গ কল্পনা করা যায় না। অন্ধ নায়িকাকে সে হাজার হাজার টাকার নোট দান ক'রে একখানা মাত্র নোট নিজের পকেটে রেখেছিল। কিন্তু মেয়েটি যখন কৃতজ্ঞতায় তার হাত চুম্বন করল, তখন সেই একখানা নোটও সে পকেট থেকে বের ক'রে তাকে দিয়ে দিল। এ দৃশ্যটি আমি আজও ভুলতে পারিনি। এমনি ভাবেই হাসি ও অশ্রু এক সঙ্গে মিলে যায় চার্লির হাতে।

কৌতুক হাস্যের অনেকগুলি স্তর আছে। যে স্তর সবচেয়ে গভীর, যা হৃদয় স্পর্শ করে, যা মানুষের দুঃখবেদনাকেই কৌতুকের আবরণে ফুটিয়ে তোলে, হাসি-কান্নার যৌগিক মিলন ঘটায়, তাই হচ্ছে উচ্চশ্রেণীর হাস্যরস। এর একটা স্থূল দিক আছে, তা অতি নিচু স্তরের। জামাই ঠকানো কৌতুক এই জাতীয়, এতে দৈহিক পীড়ন প্রধান অংশ নেয়। আধুনিক রুচিতে বীভৎস। কিছু দিন আগে এমনি কৌতুকের একটি খবর পড়েছি। শালীরা সদ্যোবিবাহিত ভগিনী-পতিকে ঠকিয়ে মজা করতে চেয়েছিল। রসগোল্লার মধ্যে আলপিন পুরে দিয়েছিল এই মজা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। জামাই তাদের শেষ হাসি হাসিয়ে হাসপাতালে মারা গেছে। গোপাল ভাঁড়ের নামে এই জাতীয় কৌতুক চলে

অনেকগুলো। আধুনিক "হরার কমিকস" এই শ্রেণীতে পড়ে—যদিও সেটি বিশুদ্ধ বীভৎস-রস।

এর বিপরীত দিকে, হাস্যরস ক্রমশ সূক্ষ্ম হতে হতে উইট বা বুদ্ধির খেলায় গিয়ে পৌঁছয়। এখানে প্রধানত কথার মারপ্যাঁচ। এখানে আক্রমণের লক্ষ্য মানুষ নয়। জীবনের সঙ্গে এর সম্পর্ক না থাকলেও চলে, কিন্তু রসের দিক দিয়ে মূল্যবান।

১৮৮৩ সনে রেভারেণ্ড এচ আর হুইস মার্কিন হাস্যরসিকদের সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন। তার ভূমিকায় তিনি বলেছেন: "হেজলিট ও অন্যান্য লেখকদের লেখা প'ড়ে প'ড়ে আমি ক্লান্ত হয়েছি, কিন্তু তাঁরা উইট ও হিউমারের যে পার্থক্য দেখিয়েছেন, তা আমার বোধগম্য হয় নি।

"আমি এই পার্থক্য নিয়ে রাতের পর রাত জেগে চিন্তা করেছি এবং শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, কোনো পার্থক্যই নেই।

"আমি কালবিলম্ব না ক'রে এ সত্য প্রচার করছি—কেননা এতে আমি সান্ত্বনা পেয়েছি প্রচুর।

"হিউমার হচ্ছে বৈদ্যুতিক পরিবেশ, উইট হচ্ছে ক্ষণপ্রভা।"

যাই হোক তিনি যে সামান্য পার্থক্য আবিষ্কার করেছেন সেটি সত্য। উইট ইন্টেলেক্টের দীপ্তি, মনকে সহসা আলোকিত ক'রে তোলে, খুশিতে ভরে দেয়, ভাসিয়ে দেয়, কখনো লজ্জা দেয়, কখনো সত্যের স্বরূপ প্রকাশ করে। রসপূর্ণ কথা, ধারালো-আলোয় ঝলমল। রবীন্দ্রনাথের মুখে এই জাতীয় কৌতুক-বাক্যের ধারা মুক্তার মতো ঝরে পড়ত। সে সবের অধিকাংশই হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। এই জাতীয় কৌতুক, যা ঘটনা বা প্লটকে অতিক্রম ক'রে ফুটে ওঠে, তা সরস-সাহিত্যের প্রাণ। রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকে এই রসের অপরূপ খেলা আছে। প্রহসনগুলিতে চরম।

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন উইটের বাদসা।

রাজশেখর বসুর কমিক-চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা বাংলাসাহিত্যে অতুলনীয়। তিনি কাউকে বাড়িয়ে না তুলে যথাযথ বাছাইয়ের দ্বারা অত্যন্ত সংযত-ভাবে

তাদের সাহায্যে এমন প্লট সাজিয়েছেন, যাতে কৌতুক আপনা থেকেই জমে উঠেছে। তাঁর ব্যঙ্গ যথাস্থানে আঘাত হেনেছে, অনেক মুখোশ খুলে দিয়েছে। তাঁর স্যাটায়ারে হিউমারের অংশ বেশি।

আর এক জাতীয় হাস্যরস আছে যাকে বলা যায় কিম্ভূত বা গ্রোটেস্ক। এই জাতীয় কৌতুকের প্লটে অসম্ভব বা অবাস্তব ব'লে কিছু নেই। সম্ভব অসম্ভব সব এতে আনা চলে। এরও কার্য্যফল অমোঘ। নিছক উপভোগ্য কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য এতে সিদ্ধ হয় আশাতীত। এর এক অংশে বার্লেস্ক, অন্য অংশে ফার্স। ল্যাম্পূন ব্যক্তিগত বিষোদ্‌গার, তা সবার মনে কৌতুক জাগায় না। ফার্স কৌতুক জাগায়।

ফার্সের এই সংজ্ঞাটি আমাদের দেশের কোনো কোনো নাট্য সমালোচকের অন্তত জানা উচিত :

"Farce in the modern sense may be described as a variety of comedy differing from other species in the grotesqueness and exaggeration of its characters and actions." (Percival Vivian : Dictionary of Literary Terms)

অর্থাৎ আধুনিক অর্থে ফার্স কৌতুকনাট্যের একটি স্বতন্ত্র জাত, এর বৈশিষ্ট্য —উদ্ভট কল্পনা, আর ঘটনা ও চরিত্রের বাড়াবাড়ি।

আরও একটি উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা :

"Farce—a form of dramatic art which makes no pretence of holding the mirror up to nature, aiming at exciting laughter and extravagant buffoonery. While the province of comedy is to reveal the humorous interplay of character upon character, and that of burlesque is to caricature some particular fashion, style or human type, the object of farce is solely to amuse." (E. Ency. Dent)

ফার্সের উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ কৌতুক, বার্লেস্কের উদ্দেশ্য বিদ্রূপ। হিউমার ও স্যাটায়ার তুলনীয়। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের অনেক গল্পাংশ নাট্যাকারে চমৎকার ফার্স হতে পারে। অদ্ভুত, কিম্ভূত এবং ভূত এই তিন

মিলিয়ে তিনি বাংলা-সাহিত্যে এমন এক বিশুদ্ধ কৌতুক রস ও মধুর ব্যঙ্গের জন্ম দিয়েছেন যা অতুলনীয়। তাঁর কাহিনীগুলির মাঝে মাঝে সমাজের নানা অসঙ্গতির প্রতি ব্যঙ্গ বর্ষিত হলেও মুলতঃ ফার্স ই তাঁর কৌতুকরসের মূল চেহারা। কাউকে আঘাত দেবার প্রয়াস নেই ; প্রাণ খুলে শুধু সবার সঙ্গে হাসা।

সব দেশের লোকই কৌতুক ভালবাসে, আমাদের দেশও ব্যতিক্রম নয়। প্রমাণ, বাংলার সাহিত্যে এবং জীবনে, সকল যুগেই হাস্যরসের জন্য জায়গা ক'রে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গল কাব্যগুলোতে, বাংলার রামায়ণে, মহাভারতে, কবি গানে, গম্ভীরা গানে এবং গোপাল ভাড় থেকে ভারতচন্দ্রের পথে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত যে প্রাচীন যুগ শেষ হয়েছে তার সর্বত্র খাঁটি বাংলা কৌতুক।

ইংরেজী প্রভাবিত কৌতুক বঙ্কিমচন্দ্র থেকে।

কিন্তু তবু একথা স্বীকার করতে হবে—হাস্য-কৌতুক ইংরেজদের জীবনের সঙ্গে যেমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, হাস্য-কৌতুক তাদের যেমন প্রিয়, এমন ঠিক আমাদের নয়। তারা এর অনুশীলন করতে করতে একে অতি পরিচ্ছন্ন, সুমার্জিত উচ্চাঙ্গের পর্যায়ে এনেছে। তারা হাস্যরসের সন্ধানে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে রেখেছে। দৈনন্দিন জীবনে একটুখানি হাসি তাদের চাই। 'উইট অ্যাণ্ড হিউমার' কত না সৃষ্টি হচ্ছে প্রতি দিন। ছোট্ট এদের আকার, কিন্তু হীরকের মতো দ্যুতি বিকিরণকারী। এগুলির অধিকাংশই এক একটি ছোট গল্প হতে পারত, কিন্তু অণু পরিমাণ পরিসরে বিন্দু আকারেই এরা পরম আদৃত।

এই উইট, হিউমার বা জোক—প্রতিদিনের জীবন যাত্রা থেকে সংগৃহীত। জীবনের সকল স্তরের লোকের প্রতি কি আশ্চর্য গভীর কৌতূহল। কি বিস্ময়কর ঔদার্য! সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সহানুভূতির দৃষ্টি চালাতে না পারলে এ জাতীয় কৌতুক আবিষ্কারের চোখ হয় না। হাস্যকৌতুকের শত রকমের শ্রেণী বিভাগ। পরিবেশের অসঙ্গতি, ভাগ্যের পরিহাস, নির্বুদ্ধিতা, ব্যঙ্গ, শ্লেষ, বৃত্তিগত বিশেষ কৌতুক, কি না আছে!

কিন্তু এই সব উচ্চস্তরের হিউমার আমাদের দেশে ব্যাপক ভাবে উপভোগ্য হয় না, সাহিত্যে বা আধুনিক কালের বড় সাহিত্য-বাহন সিনেমাতেও এর স্থান

সম্ভবত এই কারণেই সম্প্রতি এক প্রকাশ্য সভায় রাজ্যপালের উপস্থিতিতে একথা স্পষ্ট ঘোষণা হয়েছে যে, পরিহাস আমাদের জীবনে প্রয়োজন।

লক্ষণ শুভ স্বীকার করতেই হবে। সম্মেলনের নামই দেওয়া হয়েছিল পরিহাস-সম্মেলন। আশা করা যায় বাঙালী জাতি এ সম্মেলনের ইঙ্গিত যথাযথ গ্রহণ করবে এবং এতে সরকারী সম্পর্ক থাকার জন্যই একে সরকারী-পরিহাস বলে মনে করবে না।

(বসুমতী, পূজা-সংখ্যা, ১৯৫৫)

জুতো ও জুতোনো

রবীন্দ্রনাথের 'জুতা আবিষ্কার' নিতান্তই তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার—হবু রাজার আদেশে এবং গোবুচন্দ্র মন্ত্রীর মধ্যস্থতায়। আর সেটি স্বভাবতই বিশুদ্ধ কৌতুক-জুতো, ভেজিটেবল জুতোর সগোত্র। এর কারণ জুতোর দুটি ব্যাবহারিক দিকের একটিকে মাত্র 'জুতা আবিষ্কার'-এ স্বীকার করা হয়েছে, অন্যটিকে হয়নি। এই দুই দিকের একটি হচ্ছে পরার দিক, আর একটি হচ্ছে মারার দিক। 'জুতা আবিষ্কার'-এ পরার দিকটি মাত্র স্বীকৃত।

মারার দিকটি, বলা বাহুল্য, জুতোর হিংস্র দিক। কিন্তু জুতো মারা হিংসাত্মক কাজ হলেও, এটি নৈতিক হিংসা, কারণ জুতো যার পিঠে মারা হয় তার চামড়ায় যত না আঘাত লাগে, মনে লাগে তার দশগুণ বেশি।

জুতো আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জুতো মারা আবিষ্কার হয়েছে কিনা বলা শক্ত, কিন্তু জুতো যে প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কার এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আদি যুগের প্রথম মানুষ গায়ে চামড়া জড়াতে শিখেছে—সেই কত লাখ বছর আগে। চামড়া পায়ে জড়াতেও শিখেছে তখন থেকেই। তারপর মানুষ যখন নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন বিশেষ দেশের আবহাওয়া বুঝে আমিষ অথবা নিরামিষ জুতো তৈরি ক'রে নিয়েছে। ঈজিপ্টের প্রাচীন লোকেরা প্যাপিরাস্-এর স্যাণ্ডাল তৈরি করেছে, ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে পাট এবং কাপাসের সুতোয় জুতো তৈরি করেছে। এ নিয়ে গবেষণার অনেক সুযোগ আছে অবশ্যই।

এশিয়ার রুক্ষ ভূমি হিন্দুকুশ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সভ্যতায় অগ্রসর আর্যরা যখন দলে দলে এসে ভারতভূমি ছেয়ে ফেললেন, তখন অবশ্যই তাঁরা পাহাড়-পর্বত খালি পায়ে অথবা খড়ম পায়ে ডিঙিয়ে আসেননি। খড়মের সঙ্গে তাঁদের নাম যুক্ত করাই অন্যায়, কারণ খড়ম অনার্যও নয়, আর্যও নয়, দেবতাদেরও নয়,

ক্ষত্রিয়দেরও নয়, ওটি সর্বজনীন গরিব লোকের পাদুকা, মুনি-ঋষিদের বা পুরোহিত-পণ্ডিতদের পাদুকা। প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকেই পাওয়া যায়— 'শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্।' (কুকুরকে যদি রাজা বানানো যায় তবু সে কি জুতো ভক্ষণ করে না?) এ জুতো নিশ্চয় কাঠের নয়, পাটেরও নয়, চামড়ার। অতএব এদেশেও চামড়ার জুতোর প্রাচীনত্ব বিষয়ে সন্দেহ নেই, যদিও জুতো শব্দটি কবে কোথা থেকে এসেছে তা আমি জানি না।

অথচ মজা এই যে, শিল্পী যখন রামের শূন্য সিংহাসনের ছবি আঁকেন, তখন তাতে ভরত স্থাপিত রামের পাদুকা-রূপ এক জোড়া খড়ম আঁকেন, চামড়ার জুতো আঁকেন না। রাম কি এমনই নির্বোধ ছিলেন যে তিনি বনবাসে যাচ্ছিলেন খড়ম পায়ে? যে রাম শত্রুর সঙ্গে পদে পদে লড়াই করতে হবে জেনে অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়েছিলেন, তিনি প্রতি পদে একখানা ক'রে খড়ম পরেছিলেন ভাবাই যায় না। তবে কি এক জোড়া একস্ট্রা খড়ম ব্যাগে পুরে নিয়েছিলেন ভরতকে দিতে হবে আন্দাজ ক'রে? রামায়ণে কিন্তু আছে, রাম ভরতকে যে পাদুকা দেন, তাতে সোনার কাজ করা ছিল। নাগ্‌রা ব'লেই মনে হয়। শিল্পীরা তবে খড়ম আঁকেন কেন?

আর্যে অনার্যে যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হয়, তাতে আর্যরা খড়ম পায়ে যুদ্ধ করেননি। মহাভারতে জ্ঞাতিগুষ্টিতে যে যুদ্ধ হয় তাতেও খড়মের উল্লেখ নেই। এমনকি ১৯১১ সালের মোহনবাগান খেলোয়াড়দের মতো খালি পায়েও তাঁরা লড়াই করেননি, জুতো প'রেই করেছিলেন।

পৌরাণিক যোদ্ধাই হোক বা পৌরাণিক পলিটিশিয়ানই হোক, তাঁদের পায়ে স্যাণ্ডাল অথবা নাগ্‌রা। দেবতাদের পায়ে কিছুই নেই। তাঁদের খড়ম পরিয়েছে ভ্রান্ত মানুষের কল্পনা। নাগ্‌রীকে দেবনাগরী বললেও নাগরাকে কখনও দেবনাগরা বলা হয়নি, কেননা তাঁরা জুতোও কখনো পরেননি। কবি-পলিটিশিয়ান শ্রীকৃষ্ণ, দেবতা হওয়ার পর জুতো ছেড়েছেন কিন্তু খড়ম পরেননি, সর্বদা খালি পা।

আর্যরা এদেশে আসবার সময় যে-জুতো প'রে এসেছিলেন তা ছিল স্যাণ্ডালের আকৃতি। চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে বাঁধা থাকত। তাই রাগের মাথায় ফস ক'রে জুতো খুলে তাকে অস্ত্রের মতো ব্যবহারের কল্পনা তখন কারো মাথায় আসেনি। তাই সংস্কৃতে বহু নাম-ধাতুর উদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও পাদুকায়তি বা উপানহয়তি (সংস্কৃত হচ্ছে তো ?)—প্রভৃতি নাম-ধাতুর রূপ পাওয়া যায় না। নাগরা পরবর্তী কালের পাদুকা, তাই ও কথাটি সংস্কৃতে স্থান পায়নি, কিন্তু জুতো শব্দটি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'জুতোনো' নাম-ধাতুটি দেশী মতে তৈরি হয়ে গেছে। ঠিক এই রকম 'তোকে খড়মিয়ে গুঁড়ো করব' কথাটিরও উদ্ভব হতে পারত, কিন্তু হয়নি, অথচ 'তোকে জুতিয়ে লম্বা করব' কথাটি জুতোর মতোই প্রাচীন। অর্থাৎ জুতো মানেই, যা সহজে খোলা যায়, এমন জুতো। বাংলার বহু নাম-ধাতুর জনক মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তাঁরও জন্মের বহু আগে জুতোনো নাম-ধাতুর জন্ম। কিন্তু তবু পাদুকা কিংবা খড়ম থেকে নাম-ধাতু হয়নি কেন, এ এক রহস্য। নোমিন্যালিস্ট বা নামবাদীদের কাছে নাম যতটা গুরুত্বপূর্ণ, আমার কাছে নাম-ধাতু ততটা গুরুত্ব-পূর্ণ। কারণ আমি নাম-ধাতুর মধ্যে দিয়ে জাতীয় চরিত্রের পরিচয় পাই।

পাদুকা মানেই যদি স্যাণ্ডাল হয়ে থাকে, তবে এ থেকে নাম-ধাতু কেন হয়নি সহজেই বোঝা যায়। আগেই বলেছি, স্যাণ্ডাল চট ক'রে খোলা যায় না। কিন্তু খড়ম ? মনে হয় না কি যে একমাত্র নিরীহরাই খড়ম পরত এবং তারা কাউকে মারতে জানত না ? আর ঠিক এই কারণেই খড়ম থেকে নাম-ধাতু হয়নি ?

বাংলা দেশের স্কুলসমূহে 'কর্মসঙ্গীত' নামক একজাতীয় সঙ্গীতের প্রবর্তন হয়েছিল বছর পঞ্চাশ আগে, এই রকম মনে পড়ে।—কাজের তালে তালে গান গাওয়া অথবা গানের তালে তালে কাজ করা। কাজ অবশ্য সবই কাল্পনিক। পরবর্তী রায়বেঁশে নাচ-গানকেও অনেকটা এই শ্রেণীভুক্ত করা চলে। উদ্দেশ্য এই যে, গান ও কাজ একসঙ্গে করলে কাজ করা সহজ হয়। সব কাজ নয় অবশ্যই। ঠেলার কাজ, পেটার কাজ, দুরমুশের কাজ প্রভৃতিতে সঙ্গীতের চলন

আছে বহুকাল থেকে। এমন কি সেকালে ডাকাতেরাও ধ্বনি সহযোগে ডাকাতিকর্মে প্রবৃত্ত হত, সবাই জানেন।

আমার মনে হয় "তোকে জুতিয়ে লম্বা করব"—এটাও ঐ জাতীয় কর্ম-সঙ্গীতের একটি রূপ। এর মধ্যে দুটি প্রতিশ্রুতি আছে: জুতোনো ও লম্বা করা। আগে যুগপৎ ঐ দুটি প্রতিশ্রুতিই পালন করা হত, কিন্তু ইদানিং দেখছি, একটির অভাব ঘটেছে। আগে জুতোনোও হত এবং প্রহৃত ব্যক্তি কিছু লম্বাও হত। কিন্তু এখন শুধু ধ্বনিটি অবশিষ্ট আছে, আনুষঙ্গিক কর্মটি নেই।

এর তিনটি কারণ অনুমান করি:

(১) সম্ভবত এটি হয়েছে কুকুরের অনুকরণে। যে কুকুর চেঁচায়, সে কুকুর প্রায় কামড়ায় না—A barking dog will seldom bite। মানুষ শ্বনীতি ছেড়ে শ্বনীতিতে বিশ্বাসী হয়েছে।

(২) এর সঙ্গে জাতীয় স্বাস্থ্য বা মনোবলের কিছু সম্পর্ক আছে, মনে হয়। অর্থাৎ জুতোনোর ক্ষমতা নেই, কিন্তু তা গোপন করার জন্য ধ্বনিটি আছে। বরং ওর সঙ্গে "স্লা" কথাটি জুড়ে ওর মাধুর্য আরও বাড়ানো হয়েছে। মোট ধ্বনিটি (বা সঙ্গীতটি) দাঁড়িয়েছে—"স্লা, তোকে জুতিয়ে লম্বা করব।" ধ্বনিই দেয়, জুতো কিন্তু খোলে না, এমন কি খালি পা লোককেও ঐ ধ্বনি দিতে দেখেছি। বাঙালী ভীরু হয়ে পড়েছে, এটি তার প্রমাণ। কিংবা হয়তো এটি অহিংস আন্দোলনের ফল, কে জানে।

(৩) গত যুদ্ধের সময় জুতোর দাম অসম্ভব রকম বেড়ে যাওয়াতে লোকে জুতো-সচেতন হয়েছে বেশি। সহজে জুতোয় হাত দিতে চায় না। চামড়া দিয়ে চামড়া ফাটানো এখন আর তাই সুসাধ্য নয়। এক পাটি ছিঁড়লে আর কেনবার সামর্থ্য থাকে না অনেকের। এ যদি সত্য হয় তাহলে জুতোর দর এখন যখন কমতে শুরু করেছে, তখন ক্রিয়াটি পুনরুজ্জীবিত হবার সম্ভাবনা আছে কি?

গবেষকরা ভাবুন এ নিয়ে। আমি শুধু এইটুকু লাভ মনে করি যে এমন

একটি সুন্দর কাব্যের উৎপত্তি হয়েছে জুতো থেকে। "শ্লা, তোকে জুতিয়ে লম্বা করব" এটি আবেগজাত কথা, রসাত্মক বাক্য, অতএব কাব্য। নাম-ধাতু মাত্রেই আবেগজাত—যে আবেগে একদা দস্যু রত্নাকর গেয়ে উঠেছিলেন :

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥"

ওতেও সেই একই আবেগ। একটির জন্ম করুণা থেকে, অন্যটির হিংসা থেকে, কিন্তু দুইয়েরই মূলে আবেগ এবং একই আবেগ, অতএব দুয়েরই এক দাম।

(বাটানগর ম্যাগাজিন, ১৯৫৬)

কি বই পড়বো?

কি বই পড়ব? এই প্রশ্নটি আলোচনা করবার আগে বইয়ের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আমাদের মনে একটি ধারণা থাকা দরকার। বইয়ের সংখ্যা এবং বিষয়-বৈচিত্র্য প্রায় সীমাহীন, অতএব গোড়ার দিকে অনেক কথা বলা দরকার। তা ভিন্ন আমি একমাত্র বাংলা বইয়ের পাঠকরূপে গ্রন্থজগতে যে দাবী উপস্থিত করব, তা পূরণ করায় বাংলা গ্রন্থজগৎ কতখানি প্রস্তুত সে-কথাও উঠবে, এবং সেটাই হবে প্রধান কথা।

কি বই পড়ব? এই প্রশ্নটি কবি কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁর পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সম্ভবত অনেকটা সহজ ছিল। সে আজ দেড় হাজার বছর আগেকার কথা তো বটেই। অর্থাৎ এই দেড় হাজার বছর আগে কবি কালিদাসের লাইব্রেরিতে কি কি বই ছিল সে সম্পর্কে আংশিক অনুমান করা হয়তো চলে, সম্পূর্ণ চলে না। কারণ বই তখন ছাপা হত না, থাকত পাণ্ডুলিপিতে অথবা কণ্ঠে। ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, এবং অন্যান্য নানাবিধ শাস্ত্র বা আইনের বই, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, সংহিতা, কিছু পুরাণ, নাটক, জীবনী, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ—এ সব তাঁর লাইব্রেরিতে ছিল অনুমান করা যায়।

খৃঃ-পূর্ব ১৫০০ সনে আলেক্সাণ্ড্রিয়ার লাইব্রেরিতে বিবিধ বিষয়ে চার লক্ষ বই (পাণ্ডুলিপি) ছিল; এই বিবিধ বিষয়ে বিদ্যার সবটাই যে তখন শুধু অ্যালেক্সাণ্ড্রিয়ার একচেটে ছিল এমন মনে হয় না। ভারতের সঙ্গে দীর্ঘকালীন যোগাযোগ অবশ্যই ছিল। অতএব ক্লাব বা সাংস্কৃতিক বৈঠকে মিলিত হয়ে কালিদাস ও সমসাময়িক ভদ্রলোকেরা ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন বিষয়ে অবশ্যই আলোচনা করতেন, ধ'রে নেওয়া যায়।

কিন্তু কালিদাসকে মুগ্ধ করেছিল রামায়ণ ও মহাভারত। রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, শকুন্তলা প্রভৃতির প্রেরণা তিনি এই সব এপিক এবং পুরাণ থেকে

পেয়েছিলেন। অনুমান করা যায়, তাঁর বইয়ের যে ভাণ্ডার ছিল তা একটিমাত্র শেল্‌ফে স্থান পেতে পারে, তার সংখ্যা গোণা যায়, অতএব তা নগণ্য। কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করতেই হবে, তাঁর লাইব্রেরিটি বিস্তারের দিক দিয়ে খাটো হলেও বিষয়বস্তুর গভীরতার দিক দিয়ে তাকে আজও সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যাবার মতো কিছু আমরা পাইনি। রামায়ণ মহাভারতে অনেক তত্ত্বকথা বা নীতি যাই থাক, তাকে অতিক্রম ক'রে তিনি পেয়েছিলেন যুগযুগান্তব্যাপ্ত একটি জাতির মর্মকথা। আর জীবনদর্শন। আর পেয়েছিলেন চিরন্তন মানুষের পরিচয়, যে-মানুষ সুখদুঃখ, হাসিকান্না, মহত্ত্ব, বীরত্ব, ভীরুতা, ত্যাগ, লোভ, মোহ—এবং শত রকম আলো-আঁধার-ত্রুটি-বিচ্যুতি মিলিয়ে চিরদিন আমাদের আকর্ষণ করে। আজও আমরা এই মানুষকেই ভালবাসি, যদিও আজ এপিক ভেঙে গেছে। এই মানুষের কথা ছোট গল্প ও উপন্যাসের বিশেষ গঠনরীতির মধ্যে আমরা পেতে অভ্যস্ত হয়েছি। আর পেয়েছি নাটকের মধ্যে—সংস্কৃত যুগে যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, এবং যা কালিদাসই রচনা ক'রে গেছেন।

কিন্তু সেদিন থেকে আজকের দিন কত তফাৎ! গত পাঁচ শ বছরের মধ্যে মানুষের চিন্তাজগতে সব ওলটপালট হয়ে গেছে, তার চরম অবস্থা পৌঁছেছে গত পঁচিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে। বহির্বিশ্ব সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল যেমন হয়েছে গগনস্পর্শী, তেমনি মানুষ সম্পর্কেও তার কৌতূহলের অন্ত নেই। বিশ্বে যা কিছু আছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ জানবার কৌতূহল তাকে উন্মাদ ক'রে তুলেছে। এ বিশ্বের কিছু তুচ্ছ নয়, একটি ধূলিকণা আর একটি স্বর্ণকণার মধ্যে সব ভেদ আজ ঘুচে গেছে ঐ একই কৌতূহলে, সবেতেই সমান বিস্ময়।

তাই আজকের দিনে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন কি বই পড়ব—তা হলে তার উত্তরসংখ্যা সম্ভবত পৃথিবীর পাঠক-সংখ্যাকে বহুগুণে ছাড়িয়ে যাবে। কারণ বইয়ের সংখ্যা পাঠকসংখ্যাকে অতিক্রম ক'রে গেছে। ইলেক্‌ট্রোনিক মাইক্রোস্কোপে দেখা এই পৃথিবীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণিকা থেকে, প্যালোমার মানমন্দিরের ২০০ ইঞ্চি ব্যাসের টেলিস্কোপে দেখা, কল্পনাতীতরূপে বিস্তৃত শূন্যে, লক্ষ লক্ষ কোটি আলোক বৎসরের দূরত্বে ছড়ানো, অনন্তকোটি

নক্ষত্রপুঞ্জ-সম্বলিত জগতের যা কিছু দৃশ্য, এমন কি যা কিছু অনুমানযোগ্য, তার প্রত্যেকটি বিষয়ে বই আছে। ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, চেতন অচেতন উদ্ভিদ, ভূগর্ভে যত স্তর আছে, সমুদ্রগর্ভে যত বিস্ময় আছে, তারই সম্পর্কে কত বই আছে। এমন কি, যা কল্পনাতীত এবং অজ্ঞেয়, তার সম্পর্কে কত বই! সমস্ত বিশ্বের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ে কত বই! মানুষ যা কিছু করেছে, করছে এবং করবে, যে ন্যায় করেছে, যে অন্যায় করেছে, যা তার করা কর্তব্য এবং তার জীবনের শত রকম বিভাগের শত রকম কাজের, শত রকম চিন্তার, শত রকম মতবাদের, শত রকম পরিকল্পনার, শত রকম বিশ্বাসের, অসংখ্য বই। মানুষ তার অতীতে যা গড়েছে, যা ভেঙেছে, তা নিয়ে হাজার বই। তার সমস্ত অনুভূতি, চিন্তা, দর্শন, ব্যবহার, আবিষ্কার, উদ্ভাবন, যত তুচ্ছ হোক, যত বড় হোক, সব বিষয়ে হাজার হাজার বই আছে। কত জাতীয় কত বিভাগ ও উপবিভাগের বই আছে তার নিকটতম অনুমান করাও দুঃসাধ্য, প্রতিদিন হাজার হাজার বই লেখা হচ্ছে। এ ভিন্ন কাব্য, উপন্যাস, নাটক, লক্ষ লক্ষ বিচিত্র রচনা ও সমালোচনা।

লণ্ডনের এক বিখ্যাত বইয়ের দোকানে ত্রিশ লক্ষ বই সর্বদা বিক্রির জন্য মজুত থাকে। এই ত্রিশ লক্ষ বই ত্রিশ কোটি রুচিকে তৃপ্ত করতে পারে। পৃথিবীর বইয়ের বৈচিত্র্য-সংখ্যা বিবেচনা করলে ঐ ত্রিশ লক্ষ বই কিছুই নয়।

এমনি অবস্থায় আজকের দিনে কি পড়ব ভাবতে গেলে বিভ্রান্ত হতে হয়। এ এক বিরাট সমস্যা! তাই এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে বহু ঘোরা পথ পার হতে হবে, সহজ উত্তর এক কথায় দেওয়া যাবে না।

সহজ পথ একটা অবশ্য আছে। ব্যক্তিগত একজন মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ব'লেই এই সীমাহীন বিষয়-বৈচিত্র্যের বিভ্রান্তির মধ্যে একটা পথ ক'রে নেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ এই লক্ষ লক্ষ বই কয়েকটি ভাগে ভাগ ক'রে নিলে পথ একটা পাওয়া যাবে। বইগুলি সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প ও ইতিহাস এই পাঁচ ভাগে ভাগ ক'রে নিলে সমস্যা কমে যাবে অনেকখানি। এর প্রত্যেক বিভাগের অবশ্য শত শত উপবিভাগ আছে, তা বাছাইয়ের সম্পর্কে শিক্ষা ও

রুচির প্রশ্ন থাকবে। এ সবই আবার যুগ হিসাবে ভাগ করা চলে। তবে পাঠক শুধু উপভোগের জন্য বই পড়বে না শিক্ষার জন্য বই পড়বে, তার মীমাংসা আছে তার মনের মধ্যেই।

মানুষের দুই-ই চাই। কোনোটা কম, কোনোটা বেশি। উপভোগের বাসনা মানুষের জন্মগত, তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক মনের সঙ্গে, যদিও উপভোগ্য নির্বাচনের সঙ্গে ব্যক্তিগত রুচির প্রশ্ন জড়িত এবং জ্ঞানের সঙ্গে, শিক্ষার সঙ্গে, এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সে রুচি ক্রমশঃ মার্জিত হয়। জানার প্রবৃত্তিও জন্মগত এবং তা অনুশীলনের সঙ্গে বাড়ে। তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বুদ্ধির সঙ্গে।

হৃদয় মনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ হেতু উপভোগ্য সাহিত্যই পৃথিবীর সকল পঠনক্ষম মানুষের মধ্যে বেশি ব্যাপ্ত এবং প্রচারিত। গল্প শুনতে সকল মানুষই ভালবাসে এবং চিরকালই বাসবে। এর কারণ কালিদাসের কালে যেমন, আমাদের কালেও তেমনি গল্পে মানুষকেই পাই, পরিপূর্ণ জীবন্ত মানুষকে এবং তার বিচিত্র চরিত্রকে। কিন্তু মানুষকে গল্পে এনে হাজির করাই তো যথেষ্ট নয়, তার পিছনে থাকে একটি উদ্দেশ্য। শিল্পী এক একটি বিশেষ রূপ বা কাঠামোয় তাদের এনে সাজান এবং সেই সেই বিশেষ কাঠামোয় সাজালে সমস্ত মানুষ মিলে শিল্পীর সেই বিশেষ উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ করে। সামগ্রিক ভাবে তার যে একটি রূপ শিল্পীর কল্পনায় ফুটে ওঠে, সেই রূপটি দেখাবার জন্যই তাঁর মনে প্রেরণা জাগে। সেই সব মানুষকে একটি বিশেষ কালের মধ্যে স্থাপিত ক'রে সেই কালের সম্পর্কে এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে শিল্পী একটি পরিণতি দেখতে পান। তারই নাম শিল্পীর উদ্দেশ্য। তাঁর চোখে সেই পরিণতির একটা স্পষ্ট রূপ ফুটে ওঠে বলেই তিনি কাহিনী রচনায় প্রবৃত্ত হন। যে সব নরনারীকে নিয়ে তাঁর কাহিনী, তারা তাঁর সৃষ্ট হলেও তাঁর অধীন নয়, তারা শিল্পীর ইচ্ছাধীন বলা চলে না, যে যেমন সে ঠিক তেমনি চলে, তাদের অনিবার্য পরিণতিটিই চিত্রিত করতে হয়, জোর ক'রে তার উপর হস্তক্ষেপ করা চলে না। কোনো মানুষের স্বভাব যদি বদলায় তবে তা ঘটনাপ্রবাহের অমোঘ রীতিতেই বদলাবে। এই রকম জীবন্ত মানুষ নিয়েই কাহিনী।

একদিন ছিল যখন মানুষের মনে যে একটি চিরশিশু আছে শুধু তাকে ভোলাবার জন্যই গল্প তৈরি হয়েছিল। আজও সে শিশু জীবিত আছে, আজও তাকে ভোলাবার জন্য গল্প রচিত হচ্ছে কিন্তু তার চেহারা গেছে বদলে। আজ সেই শিশুকে ভোলাবার একমাত্র পূর্ব রীতিটিকে অতিক্রম ক'রে গল্প রচনার নতুন ভঙ্গির জন্ম হয়েছে। এটি নতুন শিল্পভঙ্গি আর দৃষ্টিভঙ্গিরই ফল। আগে ছিল এপিক ও রূপকথা। দুই-ই শিশুপাঠ্য ও দুই-ই বয়স্কপাঠ্য। কারণ গল্প রচনার রীতি দুইয়েরই ছিল সরল। এখন অল্প পরিসরে অনেক কথা বলবার কৌশল এসেছে, বয়স্ক শিশুরা এখন নতুন স্বাদ পেয়েছে আধুনিক ভঙ্গির মাধ্যমে।

কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য—পাঠকের কল্পনাকে জাগিয়ে তাকে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করা। এই আনন্দলোকের অনেকগুলি স্তর। আগের দিনে পাঠকমনের একটি মাত্র গবাক্ষ পথে সেই আনন্দ লোকের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটত। এখন স্তরে স্তরে একটি ক'রে জানালা খুলে যাচ্ছে। আগে নির্দিষ্ট কয়েক জাতীয় লোকের ভিতর দিয়ে ছিল পাঠকের কল্পজগতের সঙ্গে পরিচয়। এখন পৃথিবীর সকল স্তরের সকল মানুষ এসে পড়েছে সেই জগতে। এখন হাজার গবাক্ষ-পথে বিশ্বমানবের সকল সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে তার বুকে। এই সব পথে বৃহৎ মানবসমাজের আত্মার সঙ্গে তার আত্মার ঘটছে বহুমুখী যোগ। এরই ভিতর দিয়ে বিদ্যুতের ঝলকের মতো একটি বৃহৎ সত্য ক্ষণে ক্ষণে আজকের পাঠকের মনে দীপ্যমান হয়ে উঠছে: যা আছে তা ধ্রুব নয়, যা আছে তাকেই মেনে নিয়ে আত্মতৃপ্ত হয়ে থেমে থাকা চলবে না। তাকে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে যেতে হবে, বর্তমানের সকল প্রতিকূলতার সঙ্গে অবিরাম লড়াই করতে করতে এগিয়ে যেতে হবে।

মহৎ সাহিত্যে, আজকের পাঠক এই এগিয়ে চলার ইঙ্গিত দেখতে চায়, এবং এই উদ্দেশ্যের পটেই সে মানুষের সংগ্রাম দেখতে চায়। মহৎ সাহিত্যে যে সব চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, পরিকল্পিত প্লটের সম্পর্কে তাদের সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। লেখককে পৃথক্ ভাবে কিছুই ব'লে দিতে হয় না।

মানুষের জীবন নিয়ত সংগ্রামশীল। যা আছে তাতে তার তৃপ্তি নেই। মানুষের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে এবং অনেক সময় নিজেরই সঙ্গে চলেছে তার সংগ্রাম। সমস্ত মানুষের মনেই বর্তমানের বহু বাধাকে অতিক্রম ক'রে যাবার আকাঙ্ক্ষা জন্মগত। উপন্যাসে সে এই সংগ্রামের বিচিত্র রূপ দেখতে চায়। মানুষ ব্যর্থ হয়, ভেঙে পড়ে, কিন্তু তবু পড়তে পড়তেও সেই ভেঙে পড়ার অর্থের ইঙ্গিত রেখে যায়। মানুষ ব্যর্থ হয়, তবু সে তার ব্যর্থতাকে ব্যাখ্যা ক'রে যায় লেখকের সত্যনিষ্ঠাজাত সৃষ্টির ভিতর দিয়ে। পৃথক্ প্রচার দরকার হয় না, প্রচার আপনা থেকেই ফুটে ওঠে সার্থক সৃষ্টিতে, আর্টের নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থেকেও।

আর ঠিক এই কারণেই পাঠক যদি কোনো উপন্যাসে লেখকের কল্পনাশক্তির পরিচয় না পায়, যদি লেখকের সৃষ্টিকে সত্য ব'লে চিনতে না পারে, কৃত্রিম মনে হয়, যদি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি না মেলাতে পারে, অর্থাৎ লেখক যদি তাকে দীক্ষিত করতে না পারে, যদি জীবনের ব্যাখ্যা তার কাছে ভুল মনে হয়, যদি কাহিনীর ঊর্ধ্বে কোনো সত্যের সন্ধান সে না পায়, যদি কাহিনীর মধ্যে কোনো একটা ভাব বা ইঙ্গিত বা কল্পনা তার মনকে স্পর্শ না করে, যদি তার কল্পনার বাইরের কোনো সত্য তার কাছে উদ্‌ঘাটিত না হয়, যদি মানুষকে সমাজ ও কাল থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে কেবল মাত্র মনস্তত্ত্বের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখা হয়, যদি একটা মানুষকে বা একটা সমাজকে বা একটা জাতিকে বর্তমানের মধ্যেই আত্মতৃপ্ত অবস্থায় দেখানো হয়, যদি পাঠকমনের কোনো দিকের কোনো নতুন গবাক্ষ উন্মুক্ত না হয়, যদি মানুষের দুঃখ-বেদনা তার আত্মিক সত্তাকে নাড়া না দেয়, তা হলে সে কাহিনীর শিল্পমূল্য খুব বেশি নেই। তা নানা দিক দিয়ে চমকপ্রদ হতে পারে, কিন্তু তাকে মহৎ সাহিত্য বলা চলবে না।

কথা-সাহিত্যের উপর বর্তমান পাঠকের এই হল চরম দাবী। অর্থাৎ এপিকের বদলে উপন্যাস (বা নাটকের) কাঠামোয় রামায়ণ-মহাভারতের দাবী।

এইখানে ওঠে রুচির প্রশ্ন। কোন্ পাঠকের মর্মে কোন্ গবাক্ষবাহিত সুরটি এসে আনন্দ জাগাবে তা বলা শক্ত।

শিক্ষার প্রশ্নও জড়িত আছে এর সঙ্গে। চিত্রশিল্প যেমন, সঙ্গীত যেমন। সবারই স্তরভেদ আছে। একজনের যা ভাল লাগে অন্যের তা লাগে না। যে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকটি পোলাওয়ের স্বাদ পায়নি, তার কাছে ভাতের ফেন সব চেয়ে স্বাদু। উদ্দেশ্য সিদ্ধ দুইয়েতেই সমান।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সাহিত্যের একটি নিজস্ব মান এখন স্থির হয়ে গেছে। এবং ব্যক্তিগত রুচি যাই হোক, তা দিয়ে সাহিত্যের ভালমন্দ বিচার করা চলে না।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে আগের দিনের সাহিত্য সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত রুচির উপরেই নির্ভরশীল ছিল, এখন আর তা চলে না, গ্রাহ্য হয় না। এই রীতি সব দেশেই ছিল, হয়তো এখনও কিছু কিছু আছে। আগের দিনে বড় লেখক আর এক বড় লেখককে ভুল বুঝে কত উত্তেজনাই না সৃষ্টি করেছেন। আমাদের দেশের কোনো বড় লেখকই আঘাতের হাত থেকে বাঁচেননি। ইংরেজী সাহিত্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ হয়েছে আরও বেশি। এমন কি শেক্সপীয়ারও অসভ্য মাতাল বর্বর লেখকরূপে অভিহিত হয়েছেন। সাহিত্যিক গালাগালির সংকলন-গ্রন্থ পাওয়া যায় ইংরেজী ভাষায়।

কিন্তু মহৎ সাহিত্যের উপর বর্তমান কালের যে দাবীর কথা বলা হয়েছে, বাঙালী পাঠক হিসাবে বাংলা কথা-সাহিত্যের উপর সে দাবী কত দূর করা চলে? (কাব্যের কথা একেবারেই বাদ দিয়েছি, কারণ পৃথক প্রবন্ধ ভিন্ন তা আলোচনা করা চলে না)।

ইউরোপীয় মহৎ সাহিত্যের যে আদর্শ, সেই আদর্শের বিচারে এ প্রশ্নের উত্তর পাঠককেই দিতে হবে। এপিক ও ছোট গল্পের কথাও বাদ দিলাম। বরঞ্চ নাটকের নাম করা যেতে পারে এই সঙ্গে। এই আদর্শের উপন্যাস ও নাটকে বারোখানা বইয়ের নাম শুনতে চাই। এর পরবর্তী অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর বইয়ের তিন ডজন নাম লেখা চলতে পারে। তৃতীয় শ্রেণীতে খান পঞ্চাশেক। এ ভিন্ন অধিকাংশ জনপ্রিয় বইয়ের স্থান তৃতীয় শ্রেণীর নিচে।

এইবার জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে আসা যাক। জানার ইচ্ছা, অনুশীলন এবং শিক্ষার সঙ্গে বাড়ে। কিন্তু এমন লোক আছে যে কিছু জানাকে বড়ই ভয় করে। সে শুধু অতীতের বিশ্বাস এবং সংস্কারের মধ্যে ডুবে থাকে, তার সেই জ্ঞান-সীমার বাইরে আর কোনো সত্য আছে এ কথা সে বিশ্বাস করে না। আধুনিক সংস্কার-মুক্ত বিজ্ঞানে তার বিশ্বাস নেই, আস্থা নেই। যেমন এক দল দার্শনিক আছেন যাঁরা আধুনিক জ্ঞানের আলোয় বিশ্বের চরম সত্য কি সে সম্পর্কে পূর্ববর্তীদের মত পরিমার্জিত করতে করতে এগিয়ে চলেছেন, আর এক দল প্রাচীন কালের লব্ধ সত্যের বাইরে আর কোনো সত্য আছে বিশ্বাস করেন না। এমন কি থাকা উচিত নয় ব'লে বিশ্বাস করেন। আর এক দল আছেন যাঁরা জ্ঞানের পথে, বুদ্ধির পথে, চলতে ভয় পান। প্রাচীন জ্ঞান বা আধুনিক জ্ঞান, দুইয়েতেই তাঁদের সমান বিতৃষ্ণা। তাঁরা কেবলমাত্র অন্ধ বিশ্বাসের আশ্রয়ে বাস করতে ভালবাসেন। আরও এক দল আছেন যাঁরা নিজেদের ধ্যানলব্ধ অব্যবহিত সত্য ভিন্ন আর কিছু আছে বলে জানেন না। এই শেষোক্ত দল আপন মনের মধ্যে ডুব দিয়েই সব পেয়ে যান, তাঁদের আর কিছু পাবার দরকার নেই।

অতএব যাঁর যেমন শিক্ষা, রুচি বা প্রবৃত্তি, কিছু জানবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর তেমনি। এঁদের সবারই উপযুক্ত বই আছে।

কারও উপরেই জোর খাটে না, পড়া যাঁদের অভ্যাস তাঁরা আপন রুচিতে এবং গরজে বই খুঁজে নেন।

এই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। একজনের মতে যেটি গ্রাহ্য, অন্যের মতে সেটি পরিত্যাজ্য। সাধারণ শিক্ষার মান (এবং জীবনযাত্রার মান) উন্নত হ'লে তবেই কি বই পড়তে প্রবৃত্তি হয় তা না ভেবে, কি বই পড়া উচিত এ প্রশ্ন মনে জাগে।

বাছাই করার ক্ষেত্র অতি প্রশস্ত। যে দেশে শিক্ষার মান এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত, যারা অনেক জিনিস জেনেছে, তাদের আরও অনেক জানবার অদম্য বাসনা থেকেই হাজার হাজার বিভিন্ন বিষয়ের বই লেখা হয়।

অবশ্য আমাদের দেশে নয়, যদিও এটি আমাদের ইচ্ছাকৃত ত্রুটি নয়। সে কথা পরে আলোচনা করছি।

বাংলা ভাষায় বইয়ের প্রচুর অভাব। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য উচ্চ মানের বই অতি সামান্যই আছে। বহুমুখী জ্ঞানের পিপাসা তৃপ্ত করবার মতো অবস্থা আমাদের নেই। যে বই প'ড়ে আধুনিক সমাজে শিক্ষিত ব'লে পরিচয় দেওয়া যায় এ রকম বই দু একটি বিষয়ে মাত্র আছে, হাজার বিষয়ে নেই। ইচ্ছামতো যে-কোনো বিষয় বেছে নিয়ে সে বিষয়ে উচ্চ জ্ঞান লাভ করবার যোগ্য বই নেই। আমাদের নিজস্ব শিল্প, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন এবং ইতিহাস বিষয়ে এবং বিজ্ঞানের কোনো একটি বা একাধিক বিষয়ে বই আছে, কিন্তু অন্য দেশের তুলনায় তা কিছুই নয়। অনুবাদ-সাহিত্যও সামান্য আছে, এবং ফরাসী বা রুশ সাহিত্যের যে অনুবাদ আছে, তা মূল থেকে নয়, তা অনুবাদের অনুবাদ, অতএব তার কোনো মর্যাদা নেই। মূল থেকে অনুবাদ ক'রে বাংলা সাহিত্যে গৌরব বৃদ্ধি করব, এমন সঙ্কল্প নিয়ে কেউ ফরাসী, রুশ বা জার্মান সাহিত্য পড়েছেন কি না জানি না। গ্রীক সম্পর্কেও ঐ একই কথা।

ইংরেজী ভাষায় এ সব অসুবিধা নেই, যা ইচ্ছা তাই পড়া চলে, অনুবাদ সেখানে সবই মূল থেকে করা হয়, এমন কি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত শিখে সংস্কৃত সব বই অনুবাদ ক'রে নিয়েছেন তাঁদের ভাষায়। অন্য কারও সেকেণ্ড হ্যাণ্ড অনুবাদের উপর নির্ভর করেন নি।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য ইংরেজী ভাষায় কিছু পড়তে চাইলে বিশেষ সুবিধা। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র একখানি বইয়ের নাম করছি—সাড়ে তিন টাকায় আগে বিক্রি হত, এখন কত জানি না। মাত্র একখানি বই, নাম—An outline of modern knowledge. যে মূল জ্ঞান থাকলে সমাজে যথেষ্ট শিক্ষিত ব'লে পরিচিত হওয়া যায়, এই বইখানির চব্বিশটি অধ্যায় পড়লে সেই জ্ঞান লাভ হতে পারে। এর প্রত্যেকটি অধ্যায় এক একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ, মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১১০১। সবগুলি অধ্যায়ই নিজ নিজ বিষয়ের মূল তত্ত্বকথার আলোচনা, এবং প্রত্যেকটি বিষয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তির লেখা।

জ্ঞানলাভের জন্য ইংরেজীতে প্রসিদ্ধ কয়েকখানি এনসাইক্লোপীডিয়া আছে,

ব্রিটানিকা তার মধ্যে বৃহত্তম। অ্যামেরিকানা, চেম্বার্স এবং অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট অনেক রকম আছে।

আমাদের এনসাইক্লোপীডিয়া নেই। চেষ্টা হয়েছিল মাত্র। হবার সম্ভাবনা আছে। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা মিলিয়ে এক শ' খানার উপরে আধুনিক জ্ঞানের বিভিন্ন বই ছাপা হয়েছে। এই পর্যায়ে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই ছাপা হওয়ায় বাধা নেই। তা শেষ হ'লে সমস্ত বই প্রয়োজন মতো সংশোধন ক'রে এক সঙ্গে সাজিয়ে ছাপলেই বাংলায় ছোটখাটো একখানা এনসাইক্লোপীডিয়া হ'তে পারে। এর সঙ্গে এখনই যুক্ত করার মতো অনেক ভাল প্রবন্ধ যা মাসিক পত্রে ছড়িয়ে আছে তা নেওয়া যেতে পারে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্যসাধক চরিতমালা এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ প্রকাশিত বিজ্ঞানীদের জীবনী তার সঙ্গে যোগ করলে কাজটি আরও সহজ হয়।

আপাতত বাংলায় যে ক'খানা পাঠ্য বই আছে, (সেও অনেক বিভাগে একখানা বইও নেই) তার সংখ্যা কম, এবং কোনো পাঠক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো একটা বিভাগেরও শেষ কথা সম্বলিত বই বাংলায় পাবে না, তাকে ইংরেজী বইয়ের আশ্রয়ে যেতেই হবে। এটি অভিযোগ নয়। এর অনেক কারণ আছে। প্রথমত বাংলা গদ্য ইংরেজীর তুলনায় শিশু। দ্বিতীয়ত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙালীর প্রবেশ ইংরেজী শিক্ষার ফলে, আধুনিক কালে। তৃতীয় কারণ, জাতীয় চরিত্র।

বাঙালী চরিত্রে দ্রুত এগিয়ে যাবার গুণের অভাব। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম স্বাদ পেয়ে ইংরেজী সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাঙালী হঠাৎ আপন স্বভাব-ধর্মকে সাময়িক ভাবে অতিক্রম করতে পেরেছিল। দেড়শ বছর তার আয়ু ছিল। আমরা যে ক'জন বাঙালীকে জাতির গৌরব ব'লে জানি, তাঁরা সবাই এই সময়ের। জ্ঞানলাভের উগ্র আগ্রহে, কর্মে, জ্ঞান ও শিক্ষা প্রচারে, প্রচলিত অভ্যস্ত সংস্কার ও পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনে, তাঁরা ছিলেন খাঁটি ইংরেজধর্মী। তাঁরা যতদূর এগিয়েছিলেন তার পর থেকে আমরা যদি ঠিক সেই পরিমাণ

উৎসাহ ও দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারতাম তা হ'লে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হবার কারণ ছিল। কিন্তু প্রগতি থেমে আসছে। ইংরেজ যত দিন স্থায়ী হবার লক্ষণ দেখিয়েছিল তত দিন আমাদেরও এগিয়ে যাবার লক্ষণ ছিল। ইংরেজদের চলে যাবার কিছু আগে থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের কি ইতিহাস? আমরা অগ্রগতি থামিয়ে পিছনে ফিরে বসেছি। নিজেরা নির্বীর্য এবং নিষ্কর্মা হয়ে শুধু বীরপূজা করছি, যাঁদের পুজো করছি, তাঁরা যে-কাজ অসমাপ্ত রেখেছেন তাকে এক পা এগিয়ে দিচ্ছি না।

পৃথিবীর যুবশক্তির সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের কোন্ ছবিটি চোখে পড়ে? কেউ কল্পনা করতে পারেন ইংরেজ বা মার্কিন বা ফরাসী বা জার্মান যুবশক্তি সমস্ত অধ্যবসায় এবং অর্থ ব্যয় ক'রে বছরে গোটা দশেক দেবতা পুজোর, গোটা পঁচিশেক গুরুপুজোর আর নেতা-পুজোর শোভাযাত্রা বের ক'রে বছরের অধিকাংশ সময় নষ্ট করছে? এ কল্পনা করা যাবে না। আমরা কিন্তু তাই করছি। উপরন্তু বিয়ের শোভাযাত্রা আছে, রাজনৈতিক শোভাযাত্রা আছে।

আমরা স্বাধীন হবার পর অনেকখানি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছি, এতে আর সন্দেহ নেই। আজকের লেখক দল দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছেন। ক্ষমতাশীল লেখকেরা, যাঁরা বলেন সাহিত্য সকল দলের উর্ধ্বে (এবং ঠিক কথাই বলেন) তাঁরা তাঁদের সর্বশক্তি ব্যয় ক'রে তাঁদের সাহিত্যে শুধু এইটি প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে অন্য দলটা খারাপ। এই তাঁদের একমাত্র বাণী। অর্থাৎ নিজেরাই আদর্শভ্রষ্ট হচ্ছেন।

এই সব কারণে আরও অনেক কাল আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আদর্শের পথ খুঁজে বের করতে। জাতীয় চরিত্র স্বভাবতই কর্মবিমুখ হওয়াতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকাংশ বিভাগেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, দর্শন বা গবেষণালব্ধ-সত্য বিষয়ক বই বাংলায় আদৌ লেখা হবে কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্ত্য দেশে যিনি যে বিষয়ে কর্মী তিনি সেই বিষয়ে বই লেখেন। আমরা তা থেকে অপহরণ ক'রে বই লিখি। এর উপর আর এক বিপদ আসছে। অর্থাৎ

হিন্দি আসছে এবং ইংরেজী বিদায় নিচ্ছে। হিন্দি বাংলার চেয়েও দুর্দশাগ্রস্ত। বড় বড় বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক অথবা সাহিত্যিক হিন্দিভাষীদের মধ্যেও খুব আছে ব'লে জানি না। সুতরাং সে ভাষাতেও শুধু অনুবাদ পড়তে হবে যদি যথেষ্ট পাওয়া যায়, এবং অনেকগুলি আবার আমাদেরই লেখার অনুবাদ।

আপাতত বাংলা ভাষায় যে সব আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই আছে তা পড়া শেষ হ'লে এখন আমরা সোজা ইংরেজীর আশ্রয়ে যেতে পারছি। সে পথ বন্ধ হলে সম্মুখে অন্ধকার। এই অবস্থা কি আমাদের মেনে নিতেই হবে? মানা অসম্ভব ব'লে বোধ হয়। পক্ষান্তরে, ইংরেজীর উপর আরও বেশি জোর দিতে হবে। কারণ এই ভাষার সাহায্যেই আমরা বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। আমাদের যা কিছু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা তা সবই ইংরেজী শিক্ষার ফলে। এরই ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যা কিছু উন্নতি। এই উন্নতি অল্পদিনের, তাই হয়তো বাঙালী প্রতিভা উপন্যাসের বা নাটকের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ মহৎ সৃষ্টিতে আজও সফল হ'তে পারেনি, আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সেই জন্যই বাঙালী মনীষা আজও লেখনী বিমুখ। তবু বাঙালী প্রতিভার কাছে ভবিষ্যতে আশা করবার অনেক কিছু আছে।

প্রতিক্রিয়া যদি অতি প্রবল না হয়, পাশ্চাত্ত্য আদর্শে গড়া ভারতীয় ডেমোক্রেসির দেশ-গঠন আদর্শকে যদি প্রাচ্য ভক্তিরসের আতিশয্যে 'সাবোটাজ' না করি, যদি মহৎকে ঘরে ব'সে, বা পথে পথে, ঢাক পিটিয়ে পুজো করার পরিবর্তে কাজের মধ্যে দিয়ে নীরবে অনুসরণ করার প্রবৃত্তি আবার ফিরে পাই, ইংরেজ-চরিত্রের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে আদর্শরূপে সম্মুখে ধ'রে রাখতে পারি, তবেই ভবিষ্যতে বাঙালী পাঠক হিসাবে "কি বই পড়ব" প্রশ্নের উত্তরে বাংলা বইয়েরই নাম করতে পারব, নইলে নয়। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরের বাঙালী পাঠক এ প্রশ্নের উত্তর আর একবার দেবার চেষ্টা করবেন, ভবিষ্যৎ যুগ আনন্দের সঙ্গে সেই দিনের অপেক্ষা করবে।

(মাসিক বসুমতী, ১৩৫৪

তোমি কি চাউ?

'তোমি কি চাউ?' এই অভূতপূর্ব প্রশ্নটি 'তুমি কি চাও'-এর বাচ্যান্তর, প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর লেখা। ইংরেজীতে এই জাতীয় মজার মজার ভুলকে বলে স্কুলবয় হাউলার্স, বা শুধু হাউলার্স। ইংরেজদের দেশে পরীক্ষার্থীদের অদ্ভুত সব উত্তর সংগ্রহ ক'রে বই ছাপা হয়। স্কুলের ছেলেরা যে সব বিষয় অল্প জানে বা আদৌ জানে না, কিংবা মনে করে জানে, পরীক্ষার সময় সে সব বিষয়ে তাদের উত্তরগুলোতে এমন এক জাতীয় মৌলিকতা থাকে যা সর্বসাধারণের উপভোগ্য, এবং আমার মতে এই উপভোগ্য উত্তরগুলো জাতীয় সম্পত্তিরূপে গণ্য হওয়া উচিত।

বছর কুড়ি আগে বেন ট্রাভার্সের 'এ কুকু ইন দি নেস্ট' বইয়ের টাইটেল পেজে একটি স্কুলবয় হাউলারের উদ্ধৃতি দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম। কোকিলের পরিচয়ে একটি ছেলে লিখেছিল "A cuckoo is a bird which lays other birds' eggs in its own nest" (কোকিল এক জাতীয় পাখী যে নিজের বাসায় অন্য পাখীর ডিম পাড়ে)।

এই উদ্ধৃতিটি আজও মনে আছে। ইংরেজী হাউলারের বই থেকে অনেক মজার মজার উত্তর উদ্ধার করা যায়। কোনো ছেলে "বিবেকের স্বাধীনতা" মানে লিখেছে "অন্যায় ক'রে পরে অনুতাপ না করা"। কেউ "প্যাপাল বুল" মানে লিখেছে "পোপের গোরু, যে গোরু পোপের সন্তানদের দুধ দেয়"—কিংবা "A widower is the husband of a widow", কিংবা "George Washington was a remarkable person because he was an American and told the truth."

উপভোগের দিক দিয়ে এ সবের তুলনা হয় না। উপভোগ্য আরও এই কারণে যে এ সব উত্তর সজ্ঞান রসিকতা বা কৌতুক সৃষ্টির প্রয়াস নয়। সবই আকস্মিক, 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি।'

হাউলার শুধু যে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া যায় তা নয়, কলেজের ছেলে-মেয়ে এবং বড় বড় পাস করা চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকেও পাওয়া যায়, খবরের কাগজে মাঝে মাঝে সে সব উত্তর ছাপা হয়। আবার অনেক উত্তর রসিক শিক্ষকের ব্যাখ্যার দ্বারাও পরম উপভোগ্য হয়ে ওঠে। একবার এক বিখ্যাত বৈদ্যুতিক গবেষক এক স্কুলের ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বিদ্যুৎ কা'কে বলে। ছেলেটি কিছুক্ষণ চেষ্টার পর বলল, "জানতাম. কিন্তু এখন ভুলে গিয়েছি।" এ কথায় উক্ত বিজ্ঞানী বলেছিলেন, "তা হ'লে তুমিই একমাত্র লোক যে বিদ্যুৎ কাকে বলে জানতে, কিন্তু তুমিও ভুলে গেলে? তা হ'লে আর কারো কাছেই জানবার উপায় রইল না।"—বিদ্যুৎ যে প্রকৃত কি তা সত্যিই কেউ জানে না, এই কথাটিই ব্যাখ্যার সাহায্যে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

ভুল উত্তরের দিক থেকে ছোট ছেলে ও বয়স্ক লোকের মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। সবই মজার এবং শিশুসুলভ, এবং সবই এক অজ্ঞাত প্রেরণা থেকে জন্মে। কার মুখ থেকে কখন কোন্ ভুল উত্তরটি উচ্চারিত হবে তা তারা নিজেরাই জানে না, ওতে উত্তরদাতাদের কোনো হাত নেই। সবই inspired, সবই দৈব। তাই যার মুখ থেকে বা কলম থেকে হাউলার বেরোয়, সে এর স্বত্বাধিকারী নয়। আমার জমিতে সোনার খনি আবিষ্কৃত হ'লে সেটি আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয় না। হাউলার উচ্চারণকারী হাউলারের স্রষ্টা নয়, আর-সবার সঙ্গে সমানভাবে তাকে সে ভোগ করতে পারে মাত্র।

আমার মতে হাউলার অপৌরুষেয় এবং অলৌকিক। হয় তো বা মনঃসমীক্ষার সাহায্যে হাউলারের উৎপত্তি ব্যাখ্যা কিছু দেওয়া চলে। ফ্রয়েড, পাভলফ, ইয়ুং প্রভৃতিকে ধরলে কিছু সান্ত্বনা মিলতেও পারে। স্বপ্নের ব্যাখ্যাও তো হয়েছে। কারো ল্যাজ, কারো মাথা, কারো দেহ জুড়ে একটা কিম্ভূত প্রাণী। কিন্তু তবু কোনো বিশেষ পরীক্ষার্থী কোনো বিশেষ সময় সেই বিশেষ উত্তরটি কেন দিল তার ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ নয়।

গান্ধীজি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ইণ্টারমীডিয়েট ইংরেজী পত্রে একটি মেয়ে লিখছে, "Mahatma Gandhi invented an oil for baldness. This

oil was exported to other countries from Porbandar." (মহাত্মা গান্ধী টাকের তেল বের করেছিলেন, এই তেল পোরবন্দর থেকে অন্য দেশে চালান হ'ত।)—এ উত্তর আমি নিজে দেখেছি।

একজন পরিচিত পেপার সেটার আমাকে একটি চমৎকার উত্তর পাঠিয়েছিলেন। কয়েক বছর ধ'রে সেটি আমি সযত্নে রক্ষা ক'রে আসছি। তিনি লিখছেন—"এবার ম্যাট্রিকের সায়েন্সে আমরই একটি প্রশ্ন ছিল—মানবদেহে রক্ত চলাচলের রীতি বর্ণনা কর—Describe the circulation of blood in the human body. একটি ছেলে এর উত্তরটা ঠিকই লিখেছে, কিন্তু শেষে লিখেছে, কিন্তু আজ সাম্প্রদায়িক যে অত্যাচার চলছে তাতে আমাদের রক্ত স্বাভাবিক অপেক্ষা দ্রুত চলছে, ইচ্ছে হচ্ছে অস্ত্র নিয়ে বেরোই। আমি আর থাকতে পারছি না, অমি এক কবিতা লিখি—

"এর পর তিন পাতা কবিতা চলল। শেষে লিখেছে কবিতাটা আমি এখানেই রচনা করলুম। কি রকম হয়েছে, সার?"

উক্ত পেপার-সেটার আরও কয়েকটি হাউলার এই সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন, তা থেকে কয়েকটা উপহার দিচ্ছি:

অনুবাদ সংস্কৃত থেকে: "বাতেন উদরং পুরয়িত্বা—filling the belly with gout," বাংলা থেকে ইংরেজী: "এক শৃগাল এক দ্রাক্ষাস্তবক দেখিয়া—A jackal seeing a heron in grapes (ভেবেছে দ্রাক্ষাস্থ বক)।" রামের সুমতি গল্পে লিখছে—"রাম অনেকবার সুমতির পরিচয় দিয়েছে। দশরথ যখন তাকে বনে যেতে বলল সে কোনো প্রতিবাদ না ক'রে গেল। ইত্যাদি।

আমি নিজে অনেক দিন ধ'রে নানা স্থান থেকে হাউলার সংগ্রহ ক'রে আসছি, সেগুলোর কয়েকটি বিষয়ভেদে পৃথকভাবে উপহার দিচ্ছি। এ সবই বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে

(১) রবীন্দ্রনাথের বই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য চোখের বালি, গোরা, ডাকটিকিট, সোনার মনীষী ইত্যাদি।

(২) তাঁর লেখা নৌকাডুবি, চাঁদের বালি প্রভৃতি নাটক (সিনেমার স্মৃতি !)

(৩) রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে গিয়া ইংরাজি শেখেন এবং ফিরিয়া আসিয়া ইউরোপ পত্রিকা নামক এক পত্রিকা বের করেন। ('ইউরোপ যাত্রীর পত্র' নাম শুনে থাকবে, সেটিকে সাময়িক পত্র ভেবেছে)।

(৪) রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে পিত্রালয়ে পড়িতেন।

(৫) রবীন্দ্রনাথ মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন I does not know how to forget.

(৬) রবীন্দ্রনাথ বি এ পাস করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হন। তিনি কিছুকাল আদালতেও কাজ করিয়াছিলেন। (বিভিন্ন ব্যক্তির ঘটনা মিলিয়ে সিন্থেটিক রবীন্দ্রনাথ !)

(৭) রবীন্দ্রনাথ স্কুল থেকে পালিয়ে এসে মাঠে মাঠে রাখালদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। ('এবার ফিরাও মোরে'র ক্ষীণ স্মৃতি থেকে ?)

(৮) রবীন্দ্রনাথ নিজের দোষের জন্য বাল্যকালে ঘরে বন্দী থাকিতেন। (বন্দী থাকা শুনেছে ; অতএব দোষ আছে সিদ্ধান্ত)।

(৯) ইংরাজরা তাঁহাকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

(১০) ইংরেজ কবি ওয়ার্ডাসওয়ার্থ রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। (রবীন্দ্রনাথের জন্মের ১১ বছর আগে মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও !)

(১১) তিনি রাশিয়ার চিঠি, নৌকাডুবি প্রভৃতি নাটক লেখেন।

(১২) কলিকাতার অক্সফোর্ড বিদ্যালয় তাঁহাকে ডি লেট উপাধি দেন।

(১৩) "এসেছে দুয়ার ভেঙেছে জ্যোতির্ময়. তোমারি হউক জয়।"

(১৪) তিনি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে নবেল লিখিয়া পৃথিবীর মধ্যে অক্ষয় যশ অর্জন করিলেন। তিনি বহু ভাষাবিৎ ছিলেন। সকল ভাষাতেই গীত লিখিয়াছেন।

(১৫) ছোটবেলা হইতেই তিনি ভাবুক ছিলেন এবং প্রত্যেকটি কাজ ভাবিয়া তবে করিতেন।

(১৬) তিনি একধারে লেখক ও অন্যধারে কবি ছিলেন।

(১৭) তিনি জোড়াসাঁকোতে ভর্তি হইয়াছিলেন। সেখান হইতে অনেক বিদ্যা লইয়া ফেরেন। তিনি একজন হেনরির কাছে থাকিতেন। (হেনরি মর্লি, যে-কোনো একজন হেনরিতে এবং 'পড়িতেন' থাকিতেন'-এ পরিণত !)

(১৮) রবীন্দ্রনাথ শৈশব হইতেই বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার ফল প্রভৃতি গান লিখিতেন। তারপর হাইস্কুলে ভর্তি হইলেন। তখন তাঁহার গানের দিকে ঝোঁক পড়িল। এই সময় পড়া ত্যাগ করিয়া তিনি রাশিয়ার চিঠি, বাংলার সুখ প্রভৃতি কবিতা লেখেন। তারপর পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলাত যান।

(১৯) রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৮ ২২শে শ্রাবণ ইহলোক গমন করেন।

(২০) রবীন্দ্রনাথ হুগলী জেলার অন্তর্গত জোড়াসাঁকোয় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে নভেল প্রাইজ লাভ করেন। তিনি স্বদেশব্যাঞ্জন ছিলেন।

বিবিধ

(১) নন্দকুমারের মৃত্যুতে কলিকাতায় মহা আনন্দ পড়িয়া গেল।

(২) অন্নপূর্ণা বিন্দুর আসন্ন ফিট হইতে বাঁচাইবার জন্য যে ঔষধ বাহির করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার সতীত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩) কাদম্বিনী কপালে বাটির দ্বারা করাঘাত করিল।

(৪) মহশীন মাধবী ছাত্র ছিলেন।

(৫) বিদ্যাসাগর বিধাতা বিবাহ ব্যবস্থা করিলেন।

(৬) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি, যেমন লাঠালাঠি, দুই লাঠির সমান অধিকার।

(৭) বিবেকানন্দের ক্ষুরধার ছিল অসীম।

(৮) সুভাষচন্দ্র পড়িবার জন্য অ্যামেরিকা গেলেন। সেখানে শিক্ষকের নিকট বাঙ্গালীর নিন্দা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে প্রহার করেন।

(৯) শাশুড়ির কাছে নিরু শরশয্যা হইয়া পড়িলেন।

(১০) দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত জালিওয়ানা-বাগে যে হত্যাকাণ্ড হয়।

(১১) মাঝিরা যখন নৌকা দিলদরিয়ায় লইয়া যায়।

(১২) বিদ্যাসাগরকে কলিকাতার মেশিনারী স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

(১৩) নরেন্দ্র দত্ত বি, এ, পাস করিয়া বিলাত গেলেন। সেখান হইতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় পাস করিয়া ফিরিয়া আসিয়া পরমহংসদেবের শিষ্য হইলেন। তখন তাঁহার নাম হইল বিবেকানন্দ।

(১৪) ঈশ্বর সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মনে কৌতুক ক্রমে বাড়িয়া যায়।

(১৫) যে নিরুপমা খাওয়া দাওয়া এবং শর-শয্যার সময়েও একমুঠো অন্ন পাইত না।

(১৬) বি, এ, অধ্যয়ন সময়ে বিবেকানন্দ দাক্ষিণাত্যের একজন সাধু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিলেন। (দক্ষিণেশ্বর—দাক্ষিণাত্য!)

(১৭) বিদ্যাসাগর অত্যন্ত পরশ্রীকাতর ছিলেন। (পরশ্রী—পরদুঃখ!)

(১৮) বহু ধনী ব্যক্তি গরিব-দুঃখীকে ভোজন করেন।

(১৯) ভগবানের কাছে আমরা চিরকাল কৃতঘ্ন।

নির্দিষ্ট শব্দের সাহায্যে বাক্য রচনা

(১) তাহাকে বাগজালে পাইয়া তাহার উপর প্রতিশোধ লইল।

(২) হরিশ একেবারে বাগজাল ছেলে, প্রত্যেক বিষয়ে বাগজাল।

(৩) আমি সুন্দরবনে কবুলের জন্য গিয়াছিলাম।

(৪) তুমি আজকাল এত বাগজাল হইয়া পড়িয়াছ যে তোমার কথার কোনো মূল্য থাকে না।

(৫) এই বিশাল দিলদরিয়ার মাঝে একমাত্র ভগবান সহায়।

(৬) রাম বাবুর ন্যায় দক্ষযজ্ঞ ব্যক্তি এ গ্রামে বিরল।

(৭) তোমার এ মতলব শেষে দক্ষযক্ষ হয়ে দাঁড়াবে, কোনো দিন কাজে লাগবে না।

(৮) বসে বসে খেয়ে তুমি যে চিনির বলদ হয়ে পড়লে।

(৯) তোমার মাথায় যে এখন শিরে সংক্রান্তি।

(১০) তাহাকে শিরে-সংক্রান্তিতে পাইয়াছে।

(১১) তুমি একটি মিটমিটে শয়তান, অর্থাৎ শাঁখের করাত।

(১২) ছেলেটি এত দুষ্ট যে, তাহার শিরে সংক্রান্তি না করিয়া ছাড়িবে না।

(১৩) একেবারে শিরে-সংক্রান্তি ক'রে এলে, খাবার যে ফুরিয়ে গেল।

(১৪) এমন শরীর যে একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দি হয়—একেবারে চিনির বলদ।

(১৫) তোমার মত তীর্থের কাক জগতে আর একটিও আছে কি না সন্দেহ।

(১৬) তুমি যে আজকাল একেবারে পুকুর চুরির মত বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছ।

(১৭) হরিশ বাবুর পুত্র কূপ-মণ্ডুকের মত সারাদিন ঘুরে বেড়ায়।

অনুবাদের দৃষ্টান্ত (একই বাক্য বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর হাতে বিভিন্ন রূপপ্রাপ্ত)

(ক) The general outlook on life and temperament seems to be very much akin.

(১) জীবনের বাহিরের দৃশ্য এবং প্রকৃতির দৃশ্য দেখিতে অতি চমৎকার।

(২) তাহার ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপর সাধারণ বহির্দৃষ্টি অতি চমৎকার দেখায়।

(৩) সাধারণ জ্ঞানে আমি সকল জিনিস বুঝতে পারি।

(৪) সেনাপতির আচার-ব্যবহারে মনে হয়, তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন।

(৫) সেনাপতি আমাদের জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং উত্তাপ অত্যন্ত অসহ্য বলিয়া বোধ হয়।

(৬) সৈন্যাধ্যক্ষেরা তাহাদের জীবন উপেক্ষা করে এবং তাহাদের আচরণ পরিচিত বলিয়া মনে হয়।

এই অংশেরই আগে আছে : My time in Persia is coming to an end. I have not been here for long, yet I do not feel like a stranger. It is surprising that though I do not know your language, somehow I have come very close to you, and can easily communicate with you and feel the warmth of your friendship. এর একটি উৎকৃষ্ট অনুবাদ-দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল : পারসিয়াতেই আমার শেষ সময় হইয়াছে, আমি এখানে বেশি দিন থাকিতেছি না। এই সমস্ত আমি মোটেই পছন্দ করি না। তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা কিরূপ তাহা আমি জানি না। আমি আমার অমূল্য সময় নষ্ট করিতেছি।

(খ) It seems that a young lady has arrived in a state of excitement, who insists on seeing me.

(১) একজন যুবতী উত্তেজিত হইয়া রাষ্ট্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

(২) একটি ভদ্রমহিলা এসেছেন রাষ্ট্রকে উত্তেজিত করিতে।

(৩) যুবতী উত্তেজনার বশে আমাকে দেখিতেছে।

(৪) একটি সুন্দরী বালিকা একটি নগরে উত্তেজিত অবস্থায় ঢুকিয়াছেন।

(৫) আমার মনে হয় যে, একটি যুবতী রাষ্ট্রে নামিয়াছিলেন, যিনি আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন।

(৬) ইহাই মনে হয় অল্পবয়স্কা একজন মহিলা প্রচুর আবেগ লইয়া আসিয়াছেন।

(৭) মনে হইল এক ভদ্র মহিলা উত্তেজিত অবস্থায় রাষ্ট্র অতিক্রম করিয়াছে।

(৮) মনে হচ্ছে একটি যুবতী রাষ্ট্রের দ্বারা আক্রান্ত।

(৯) মনে হয় এক ভদ্রমহিলা excitement-এর দরবার থেকে এখানে এসে পৌঁছিয়াছেন।

(১০) একজন নারী ক্রুদ্ধভাবে ষ্টেশনে নামিল।

(১১) একজন যুবতী উপস্থিত হইয়াছিল রাজ্যের কাজ দেখিবার জন্য সে আমাকেও দেখিবে।

(১২) একজন যুবতী কোন আনন্দের দেশ হইতে আসিয়াছিল যে আমাকে দেখিতে চায়।

(১৩) মনে হয় এক যুবতী রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আমার কাছে আসিয়াছে।

The muslin of Dacca was compared to a spider's web for fineness.

(১) দাক্ষিণাত্যের মুসলমানেরা মাকড়সার সূতা দিয়া মসৃণ ধুতি প্রস্তুত করিতেছে। (Dacca—দাক্ষিণাত্য, muslin—মুসলমান।)

(২) ঢাকায় মুসলিম মিলে সূক্ষ্ম কাপড় তৈয়ারি হইত।

স্টেট অফ এক্সাইটমেণ্ট কথাটি যত অনিষ্টের মূল। স্টেট মানে রাজ্য বা রাষ্ট্র। স্টেট মানে স্টেশন লিখেছে একজন। জেনারাল আউটলুক-এর জেনারাল যেমন সেনাধ্যক্ষ হয়েছে তেমনি তা জেনারাল নলেজ বা সাধারণ জ্ঞানেও পরিণত হয়েছে। কিন্তু ঢাকা ডেকান হলেও ঢাকাই মসলিন ঢাকার মুসলিম মিল হয় কি ক'রে তা বুদ্ধির অতীত।

অতঃপর ব্যাকরণের কয়েকটি উৎকৃষ্ট নমুনা দিয়ে "তোমি কি চাউ?" শেষ করি।

(১) তামাটে = তামা + টে, যে খুব তামাক খায় এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয়।

(২) যে সকল শব্দের উত্তর ণিচ প্রত্যয় হয় তাহাদিগকে ণিজন্ত ধাতু বলে, যথা, অম্ল, অম্বল।

(৩) নিধান মানে যে ধৈতে একটিও ধান নাই।

(৪) অনন্বয়ী অব্যয়—যে অব্যয়ে অনুনয় বিনয় প্রকাশ করা হয়।

(৫) আছ ধাতুর রূপ : আছিতম্, আছিতঃ ; আছ, আছিতঃ আছিম ইত্যাদি।

(৬) ধেয়, যেমন কুকুর শৃগালটিকে ধেয় করিয়া আসিল।

(৭) চোখে ডুমুরের ফুল দেখিল।

(৮) মিতালি, মিত+আলি অপত্যার্থে, তামাটে তামা+টে অপত্যার্থে।

বাংলা রসসাহিত্যে বঙ্গসন্তানদের এই সব অমূল্য দান দেশে প্রায় অবহেলিত হয়ে প'ড়ে থাকে। এটি অন্যায়। যাদের কলম থেকে এই সব রত্নরাজি ঝ'রে পড়েছে, তারা এর জন্য দায়ী নয়। প্রেরিত বা প্রেরণাপ্রাপ্ত মুহূর্তে তাদের অবচেতন মনের সৃষ্টি এসব। কলমও এর কৃতিত্ব দাবী করতে পারে না। রত্ন ঝরে, এজন্য শুধু তা ঝরণা কলম এই নামটি দাবী করতে পারে মাত্র।

ইংরেজী হাউলারের অনেক বইতে উত্তরদাতার নাম ও স্কুলের নাম ছাপা থাকে। এ দেশে সে রকম ছাপা হওয়ায় বাধা আছে। কেননা উত্তরদাতাদের সন্ধান পেলে এ দেশের অনেকে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত সন্দেহে তাদের পায়ের ধুলো নিতে ছুটবে। প্রেরণাপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রেই এদেশে প্রায় দেবতার সম্মানপ্রাপ্ত। সুতরাং নাম প্রকাশ নিরাপদ নয়।

এই সব মুক্তা যাদের কলম থেকে বেরিয়েছে, তারা কেউ নির্বোধ নয়, সাময়িক ভাবে তারা বিভ্রান্ত। কোনো প্রেতশক্তি বা দৈব তাদের উপর ভর করে লেখার সময়। ভরমুক্ত হলে তারা নিজেরাই অবাক হয়ে যায় এ সব দেখে। তখন নিজেরাই হাসে এবং উপভোগ করে। অণু-পরিমাণ ধূলিকণা ঝিনুকের দেহে প্রবেশ করলে ঝিনুকও এই ভাবেই ভরপ্রাপ্ত হয়ে মুক্তা গড়ে। আশা করি, মুক্তাভস্মের লেখক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক এই মুক্তাগুলি ভস্ম করবেন না।

(বসুমতী, পূজাসংখ্যা, ১৯৫৬)

রেলের ভ্রমণ

পঁচানব্বুই বছর আগে শোভাবাজার বালাখানা থেকে প্রকাশিত সম্বাদ ভাস্কর নামক খবরের কাগজে (১০-৮-১৮৫৪) এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় :—

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেইলওএর বিজ্ঞাপন

"সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে, বর্তমান ১৫ই আগষ্ট (১৮৫৪) মঙ্গলবাসরে ও তৎপরে নিম্নলিখিত নির্দ্দিষ্ট সময়ানুসারে হাবড়া ও হুগলী হইতে রেইলওএর গাড়ি-সকল ছাড়িবেক, বালী শ্রীরামপুর ও চন্দননগর থামিবেক।

হাবড়া হইতে পূর্ব্বাহ্লে ১০ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ও অপরাহ্লে ৫ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের সময় ছাড়িবেক।

হুগলী হইতে পূর্ব্বাহ্লে ৮ ঘণ্টা ২২ মিনিট ও অপরাহ্লে ৩ ঘণ্টা ৩৮ মিনিটের সময় ছাড়িবেক।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিবসে ও তৎপরে হাবড়া হইতে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত গাড়ি-সকল চলিবেক, পথিমধ্যস্থিত যাবতীয় আড্ডায় থামিবেক।
যে সকল গাড়ি প্রথম শ্রেণীর গাড়ি বলিয়া ব্যবহারার্থ আছে তাহা অতি ত্বরায় রহিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে অত্যুৎকৃষ্ট গাড়ি সকল হইবেক সেই সকল গাড়ি সম্প্রতি নির্ম্মাণ করা যাইতেছে।

যাঁহারা স্বল্পমূল্যে মাসিক অথবা সাময়িক টিকিট ক্রয় করিতে অভিলাষ করেন তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা যে-কোন আড্ডায় তদ্বিষয়ক প্রার্থনা জানাইলে ডৌলসকল লিখনের দ্বারা পূর্ণ করিয়া মেনেজিং ডাইরেক্টর ও এজেণ্ট অর্থাৎ কর্মাধ্যক্ষ সাহেবের সমীপে প্রেরিত হইবেক।

রেইলওএ কর্ম সম্বন্ধীয় সমারোহপূর্ব্বক যাত্রা সর্ব্বসাধারণের সুবিধা জন্য আগামি ১৮৫৫ সালের ১ জানুয়ারি পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল তৎকালীন রাণীগঞ্জ অবধি পথ মুক্ত হইবেক ঐ পথ ১২২ মাইল, এতজ্জন্য যে সমস্ত

নিয়ম নির্দ্ধারণ করা যাইতেছে তাহার যথাযোগ্য অগ্রিম বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবেক।

R. Macdonald Stephenson,
Managing Director & Agent.
২৯ থিয়েটার রোড, কলিকাতা।
৭ আগষ্ট, ১৮৫৪।"

এর ১২ দিন পরে সম্বাদ ভাস্করে এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়—

"স-ভা ২২-৮-২৮৫৪। লৌহবর্ম্ম দিয়া বাষ্পীয় শকট চলিতেছে ইহাতে প্রতি দিবস হাবড়া শ্রীরামপুর ফরাসডাঙ্গা হুগলি এই চারিস্থানে লোকারণ্য হইতেছে লোকেরদের ভিড়ে টিকীট বিক্রয় গৃহে ক্রেতারা প্রবেশ করিতে পারেন না, যাঁহারা ঠেলাঠেলী করিয়া অতি কষ্টে অগ্রে যান তাঁহারাই টিকীট প্রাপ্ত হন তদ্ভিন্ন প্রতি দিবস প্রতি আড্ডা হইতে দুই আড়াই শত লোক ফিরিয়া যাইতেছেন ইহাতে রেলরোড কোম্পানীদিগের লাভের হানিও হইতেছে, হাবড়া হইতে যাঁহারা হুগলি যাইবেন কিম্বা হুগলি হইতে যে সকল আরোহীরা কলিকাতায় আসিবেন তাঁহারা টিকীটের অধিক মূল্য দিবেন, কিন্তু সে সকল লোক বাছনী হয় না, হাবড়া হইতে যে সকল লোক শ্রীরামপুরে গমন করিবেন কিম্বা হুগলি হইতে যে সকল ব্যক্তি ফরাসডাঙ্গায় আসিবেন তাঁহারাই অগ্রে টিকীট লইয়া যান অধিক মূল্য-দাতাদিগের ফিরিয়া যাইতে হয় ইহাতে ঐ সকল ব্যক্তিরা দুঃখ পান এবং রেলওএ কোম্পানিদিগের পক্ষেও লাভের অনেক ব্যাঘাত হয়, আর বহু জনতায় ইহাও হইতেছে নীচ শ্রেণীতে গমনীয় টিকীটে ক্রেতারা উচ্চ শ্রেণীতেও যাইতেছেন, আমরা রেলরোড কোম্পানিদিগের লভ্যের উন্নতি দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি অতএব প্রার্থনা করি এই সকল গোল নিবৃত্তির কোন সদুপায় হয়, হুগলি হইতে কলিকাতা, কলিকাতা হইতে ফরাসডাঙ্গা অর্থাৎ দূর দূর গমনশীল ব্যক্তিগণ যাঁহারা অধিক মূল্য দিয়া টিকীট ক্রয় করিবেন অগ্রে বাহিরে তাঁহাদিগের বাছনী করা যায় তৎপরে তাঁহাদেরই

অগ্রে টিকীট বিক্রয়ের ঘরে প্রবেশ করিতে পারেন অগ্রে তাঁহাদিগকে টিকীট বিক্রয় করিয়া যদি টিকীট থাকে তবে নিকট নিকট গমনাভিলাষী ব্যক্তিগণকে দিবেন ইহাতে রেলরোড কোম্পানিরাও লভ্যে বঞ্চিত হইবেন না এবং নিকট নিকট গমনেচ্ছু ব্যক্তিরাও অধিক দুঃখ পাইবেন না, এইক্ষণে বাষ্পীয় শকটে গমনার্থ যত লোক উৎসাহান্বিত হইয়াছেন তাঁহারদিগের গমনোপযুক্ত গাড়ি সকল শীঘ্র প্রস্তুত হউক, যাঁহারা এই বিষয়ে লভ্য করিতে উৎসুক হইয়াছেন তাঁহারা অতি শীঘ্র অধিক গাড়ি প্রস্তুত করিলে দেখিতে পাইবেন প্রতি দিবস গাড়ি ভাড়ার টাকা রাখিবার স্থান পাইবেন না।

রেলরোড বিষয়ে প্রথমাবধি আমরা অধিক পরিশ্রম করিয়াছি রেল-রোড কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত আর এম টিফেনসন সাহেব এ বিষয়ের অনুষ্ঠানকালে পত্রদ্বারা আমারদিগকে তাঁহার বাসস্থলে লইয়া গিয়াছিলেন এবং রোলরোড বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য আমারদিগকে অনুরোধ করেন তাহাতে আমারদিগকে সহিত তাঁহার যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল তাহা সাহেবের স্মরণ থাকুক না থাকুক আমরা যাহা স্বীকার করিয়াছিলাম তদনুরূপ কর্ম্ম করিয়াছি সাহেবের রেলরোড কার্য্যের বিস্তারতা বিষয়ে ইংরাজীভাষায় তদভিপ্রায় মুদ্রাঙ্কিত করিয়া আটশত পুস্তক আমার-দিগের নিকট পাঠাইয়াছিলেন আমরা কলিকাতায় এবং জেলায় জেলায় ধনি লোকদিগের নিকট তাহা পাঠাইয়া এবং অনেক লিখিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলাম এই কারণ রেলরোডের বিষয়ে আমারদিগের সম্পূর্ণ স্নেহ আছে অতএব রেলরোড কর্ম্মচারী প্রধানদিগকে লভ্যের বিষয়ে উপরে লিখিত পরামর্শ দিলাম তাঁহারা যেন ইহা স্মরণ রাখেন।

পূর্বে উদ্ধৃত বিজ্ঞাপনে রেল কম্পানি মাসিক টিকিটের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু পরবর্তী সপ্তাহের (১৭-৮-১৮৫৪) একটা বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে "খরচার হার অর্থাৎ যে হিসাবে কেরিয়া দিতে হইবে তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইবেক। মাসিক টিকিট আগামী ১ জানুয়ারির (১৮৫৫) পূর্ব্বে বহির্গত হইবেক না।"

সমসাময়িক জনসাধারণের আগ্রহ

যা হোক, প্রথম রেলগাড়ি যে আমাদের দেশে একটা আনন্দের বিস্ময়ের এবং কৌতুহলের তরঙ্গ তুলেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রথম রেলগাড়ি আসছে—লোকে আকুল আগ্রহে তার দিন গুনছে, বিলম্ব আদৌ সহ্য হচ্ছে না। কি কারণে নিদিষ্ট তারিখে রেলপথের কাজ কিছু পিছিয়ে পড়েছিল, তাতে অনেকেই খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। প্রথম হাওড়া স্টেশন হতে ট্রেন যাতায়াত শুরু হয় ১৮৫৪ সালের অগস্ট মাসে। তার ছ'মাস পূর্ব্বে সম্বাদ ভাস্করে লেখা হচ্ছে।

> রেইলওএর কার্য্যের শৈথিল্য সম্বাদ প্রাপ্তে আমরা অসুখী হইয়াছি, কর্ম্মকর্ত্তা মহাশয়েরা কার্য্যের সত্বরতার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

এর পর রেলগাড়ি চলবার দু'মাস পরে ৫-১০-১৮৫৪ তারিখের সংবাদে জানা যায়—

> রেইলওএ শকটারোহণে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অধিকতর আমোদ জন্মিয়াছে সর্ব্বসাধারণে তদারোহণে এত আয়াস প্রকাশ করিতেছেন যে, শকটে অবস্থান স্থান হয় না এবং টিকীট বিক্রয় স্থলে লোক ভিড়ে প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিতে পারিলে অনেকে ধন্য মনে করেন।

আজ প্রায় একশ বছর পরেও অবশ্য ভিড়ে প্রাণ নিয়ে প্রস্থান করতে পারলে অনেকে ধন্য মনে করেন, তবে এটি যে অধিকতর আমোদের ফল স্বরূপ নয় সে কথা বলা বাহুল্য। প্রথম সময়ে যা আমোদ মনে হয়েছিল এক শতাব্দী পরে তা জরুরি প্রয়োজনের সীমানায় এসেছে, যদিও দেশের অবস্থা তখনও ভাল ছিল কিনা সন্দেহ। তখনও লোকে দারিদ্র্যের জন্য আর্ত্তনাদ করছে। সেই সময়ের একটি সংবাদ উদ্ধৃত করি—

> কলিকাতা নগরে সকল বস্তুই মহার্ঘ। তবে দরিদ্র লোকদিগের জীবন রক্ষার উপায় কী শারদীয়া পূজা নিকট হইয়াছে দোকানি পসারিরাও দ্রব্যাদি অগ্নিমুল্য করিয়া তুলিয়াছে। মধ্যম প্রকার মুগের মোন ২৷৹

টাকা অড়হরের মোন ২।৶৹ মাস কলাই মোন ১॥৹ জিরা মরিচ সের ।৶৹ লঙ্কা সের ৵১০ আতপ তণ্ডুল যাহা দুর্গা নৈবেদ্যে ব্যবহার হয় তাহার মোন ২॥৹ টাকা মধ্যম প্রকার ঘৃত সের এক টাকা।

রেল পথের প্রথম যুগের সাহিত্যেও খুব চমৎকার একটি বাস্তব ছবি পাওয়া যায়। "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"তে সমসাময়িক নাগরিক জীবনের অনেক ছবিই দেখা যায় যা বাস্তবতার দিক হ'তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায় ফোটোগ্রাফ-ধর্মী সুতরাং এর রেলওয়ের এই চিত্রটিও খুব চিত্তাকর্ষক, পড়লে চোখের সম্মুখে একটি জীবন্ত ছবি ফুটে ওঠে। প্রবন্ধটির নাম "রেলওয়ে"।

দুর্গোৎসবের ছুটিতে হাওড়া হতে এলাহবাদ পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলেছে, রাস্তার গোড়ে মোড়ে লাল কাল অক্ষরে ছাপানো ইংরাজী বাঙ্গলায় এস্তেহার মারা গ্যাছে; অনেকেই আমোদ করে বেড়াতে যাচ্ছেন—তীর্থ যাত্রীও বিস্তর।...টুন্নুনাং টাং টুন্নুনাং টাং টাং করে রেলওয়ে ইষ্টিম ফেরি (আরমানি ঘাট) ময়ুর পঙ্খীর ছাড়বার সঙ্কেত ঘণ্টা বাজছে, থার্ডক্লাস বুকিং আপিসে লোকের ঠেল মেরেছে, রেলওয়ের চাপরাসীরা সপাসপ বেত মাচ্ছে ধাক্কা দিচ্ছে ও গুঁতো লাগাচ্চে তথাপি নিবৃত্তি নাই। "মশাই শ্রীরামপুর!" "বালি! বালি!" বর্দ্ধমান মশাই!" আমার বর্দ্ধমানেরটা দিন না" শব্দ উঠেছে, চারিদিকে কাঠের বেড়া ঘেরা বুকিং ক্লার্ক সন্ধ্যা পূজার অবসর মত ঝোপ বুঝে কোপ ফেলছেন। কারো টাকা নিয়ে চার আনার টিকিট ও দুই দোয়ানি দেওয়া হচ্চে, বাকী চাবামাত্র 'চোপরও' ও 'নিকালো' কারো শ্রীরামপুরের দাম নিয়ে বালীর টিকিট বেরুচ্চে, কেউ টিকিটের দাম দিয়ে দশ মিনিট চীৎকার কচ্চে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। কম্পর্টর মাথায় জড়িয়ে ঝড়াক ঝড়াক করে কেবল টিকিটে নম্বর দেবার কল নাড়চেন, শিস দিচ্চেন, ও উপরি পয়সা পকেটে ফেলচেন, পাইখানার কাটা দরজার মত ক্ষুদে জানালা টুকুতে অনেকে হুজুরের মুখ দেখতে পাচ্চে না যে কথা কয়ে আপনার কাজ লয়। যদি চীৎকার করে ক্লার্ক বাবুর চিত্তাকর্ষণ কত্তে

চেষ্টা করে, তখনি রেলওয়ে পুলিসের পাহারাওয়ালা ও জমাদারেরা গলা টিপে তাড়িয়ে দেবে। এদিকে সেকেন ক্লাস ও গুডস ও লগেজ ডিপার্টমেণ্টও এই প্রকার গোল, সেখানে ক্লার্কবাবুরাও কতক এই প্রকার। কিন্তু এত নয়। ফাষ্ট ক্লাস সাহেব বিবির স্থল, সেখানে টুঁ শব্দটি নাই, ক্লার্ক রিক্ত হস্তে টিকিট বেচতে আসেন ও সেই মুখেই ফিরে যান, পান তামাকের পয়সাও বিলক্ষণ অপ্রতুল থাকে। বাবাজীরা নটবর বেশে থার্ড ক্লাস বুকিং অপিসের নিকট যাচ্চেন, এমন সময় টুন্টুনাং টাং টুন্টুনাং টাং শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠলো ফোঁস ফোঁস করে ইষ্টিমারের ইষ্টিম ছাড়তে লাগলো, লোকেরা রল্লা বেঁধে জেটি দিয়ে ইষ্টিমারে উঠতে লাগলো—জলদি চলো! চলো! শব্দে রেলওয়ে পুলিসের লোকেরা হাঁকতে লাগলো। বাবাজীরা অতি কষ্টে সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে টিকিট চাইলেন। বুকিং ক্লার্ক বাবাজীদের চেহারা দেখে ফিক করে হেসে হাত বাড়িয়ে টাকা চেয়ে নিয়ে টিকিট কাটতে লাগলেন। এদিকে ঝাপ ঝাপ শব্দে ইষ্টিমারের হুইল ঘুরে ছেড়ে দিলে। এদিকে প্রেমানন্দ মশাই টিকিটগুলি শীঘ্র দিন ইষ্টিম খুল্লো ইষ্টিম চল্লো বলে চীৎকার কত্তে লাগলেন, কিন্তু কাটা কপাটের হুজুরের ভ্রূক্ষেপ নাই। শিস দিয়ে "মদন আগুন জলছে দ্বিগুণ কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী" গান ধল্লেন। "মশাই শুনচেন কি? ইষ্টিম খুলে গ্যালো, এরপর গাড়ী পাওয়া ভার হবে, একি অত্যাচার মশাই!" ক্লার্ক "আরে থামো না ঠাকুর' বলে এক দাবড়ি দিয়ে অনেকক্ষণের পর কাটা দরজা হতে হাত বাড়িয়ে টিকিটগুলি দিয়ে দরজা বন্ধ করে পুনরায় "ইচ্ছা হয় যে উহার করে প্রাণ সঁপে সই হইগে দাসী মদন আগুন—।" "মশাই বাকী পয়সা দিন, বলি দরজা দিলেন যে?" সে কথায় কে ভ্রূক্ষেপ করে? "জমাদার ভিড় সাফ কর, নিকালো, নিকালো" বলে ক্লার্ক সেই কাঠগড়ার ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, রেল পুলিসের পাহারাওলা ধাক্কা দিয়ে বাবাজীদের দলবল সমেত টরমিনাস হতে বার করে দিলে।

সমসাময়িক কাল

আমাদের দেশে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ ও এক আনা মাশুলে সর্বভারতীয় পত্র চলাচল ব্যবস্থা লর্ড ডালহৌসির আমলে প্রচলিত হয়, এবং যে বৎসর এডুকেশন ডেচপ্যাচ এদেশে পৌঁছয় এবং তদনুরূপ শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত হয়, সেই বৎসরই প্রথম রেলগাড়ি চলে। এই সঙ্গে যদি চিন্তা করা যায়— তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স ৩৭, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বয়স ৩৪, মধুসূদনের বয়স ৩০, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের বয়স ১৬, তা হলে সমসাময়িক ছবিটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথম রেল বিস্তারের কয়েকটি বৎসর

ই-আই-আর

হাওড়া-হুগলি ১৫-৮-১৮৫৪
হুগলী-পাণ্ডুয়া ১-৯-১৮৫৪
পাণ্ডুয়া-খানা ৩-২-১৮৫৫
খানা-রাণিগঞ্জ ৩-২-১৮৫৫
রাণিগঞ্জ-সিয়ারসল ২১-৭-১৮৬৩
সিয়ারসল-সীতারামপুর ১-১-১৮৬৫
সী-রা-পু-লক্ষ্মীসরাই ১-১-১৮৭১
ল-স-দানাপুর ১৭-১১-১৮৬২
দানাপুর-মোগলসরাই ২২-১২-১৮৬২

ই-বি-এস-আর

কলি-রানাঘাট ২৯-৯-১৮৬২
রানাঘাট-পোড়াদহ ১৫-১১-১৮৬২
পোড়াদহ-ভেড়ামারা ১৯-১-১৮৭৮
পোড়াদহ-জগতি ১৫-১১-১৮৬২
জগতি-কুষ্টিয়া ১৬-২-১৮৬৪
গোয়ালন্দ পর্যন্ত ২৬-১০-১৮৯৮
কলিকাতা-সোনারপুর ২-১-১৮৬২
ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত ২৫-৪-১৮৮৩

ব্রিটেনের অবস্থা

আমাদের দেশে রেল বা ইঞ্জিন কিছুই প্রস্তুত নয়। রেলপথ প্রতিষ্ঠাতা কম্পানিগুলির মধ্যেও দ্বন্দ্ব কিছু ছিল না, কিন্তু এ প্রসঙ্গে ব্রিটেনের রেল পথের প্রথম যুগে যে উন্মাদনা উপস্থিত হয়েছিল তার বিবরণ পড়লে বিষম কৌতুক বোধ হয়। সেখানে একদিকে যেমন বহু কম্পানি প্রোমোটার পরস্পর অতি মারাত্মক রকমের প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল, অন্য দিকে তেমনি এদের হাতে জনসাধারণের টাকা মারা যাওয়াতে এক অংশ এবং রেলগাড়ি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বিবেচনা-কারী কতক ব্যক্তি রেলওয়ের বিরুদ্ধে খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন। মিঃ ক্রীভি (এম পি) ১৮২৫ সালে স্টীম ইঞ্জিন সম্পর্কে বলছেন—"This infernal nuisance—the locomotive Monster carrying Eighty tons of goods and navigated by a tail of smoke and sulphur coming thro' every man's grounds between Manchester and Liverpool—the devil of a railway—" (Lytton Strachey : "Books and Characters" হ'তে উদ্ধৃত)।

প্রথম রেলপথের যুগে গ্রেট ব্রিটেনের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সত্যই উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন। প্রায় প্রতি পার্লামেণ্টারি বৈঠকে একটি ক'রে নতুন রেলপথের জন্য বিল পাস হচ্ছিল এবং পরে সমস্ত রেলপথ এক নিয়ন্ত্রণাধীন না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন কম্পানি প্রতিযোগিতা করে ২৫০টির বেশি পৃথক রেলপথ খুলেছিল। সে সময় শেয়ার কিনে কত লোক যে সর্বস্বান্ত হয়েছিল তার হিসাব নেই। রেলপথকে বিদ্রূপ ক'রে কত কার্টুন ছবি তখন ছাপা হত। একটি ছবিতে দেখা যায় একজন স্থূল-দেহ প্রোমোটার ছোট্ট একখানি ইঞ্জিনের উপর এক পা রেখে (স্কেটিং-এর ভঙ্গিতে) দ্রুত ধ্বংসের পথে ধাওয়া করেছেন। আর একটি ছবিতে দেখা যায়, এক অস্ত্র চিকিৎসকের দরজার বাইরে একটি লটবহর সম্বলিত লোককে দেখে উক্ত চিকিৎসকের দালাল তাঁকে ঠিকানাযুক্ত কার্ড দিয়ে বলছে, "রেলগাড়িতে যাবে তো? তা হ'লে এই কার্ডখানা রেখে

দাও।” এর অর্থ এই যে, রেলভ্রমণে দুর্ঘটনা অনিবার্য। তখন এই অস্ত্র-চিকিৎসকেরই শরণাপন্ন হতে হবে; অতএব ঠিকানাটা রাখা দরকার। এই সময়ে দুর্ঘটনার সংখ্যা সত্যই ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। যাত্রীর নিরপত্তা সুনিশ্চিত করবার জন্য “পাঞ্চ” কাগজ কার্টুনের সাহায্যে একটি পরিকল্পনা দেন। তাতে দেখা যায় রেলওয়ে ডাইরেক্টর ইঞ্জিনের সম্মুখে বসে আছেন; কারণ ডাইরেক্টর ওখানে বসলে যাত্রীরা নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

বিপদ এড়াবার জন্য তখন শুধু সিগন্যালের উপর ভরসা না ক'রে সিগন্যাল-ম্যান নিজেও সিগন্যালের পাশে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে চিৎকার করত। আর একটি কার্টুনের ছবি বেশ মজার।

এই ছবিতে দেখা যায়, গাড়ি হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেছে। আতঙ্কগ্রস্ত যাত্রীরা সব জানালা থেকে মুখ বের করে গার্ডকে জিজ্ঞাসা করছে—“ব্যাপার কি?” গার্ড নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে তার জবাবে বলছে, “এমন কিছু নয়, আর একখানা গাড়ির সঙ্গে আমাদের গাড়ির একটু গুঁতো লেগেছে।” যাত্রীরা বলছে “কি সর্বনাশ, আমাদের পিছনেও একখানা গাড়ি ছুটে আসছে, না?” গার্ড বলছে, “আসছে ঠিকই, তবে একটা ছোকরাকে সিগন্যাল হাতে পাঠিয়েছি, হয় তো সেটা ওরা দেখতেও পারে।”

কিন্তু গ্রেট-ব্রিটেনে রেলপথের ব্যবসা প্রথম দিকে এ রকম মারাত্মক হলেও আমাদের দেশে ১৮৮৮ সালের হিসাবে নিট আয় হয়েছিল ৫০,২৫,৪২৪ টাকা। লাভ হয়েছিল শতকরা ৫'৯০। অথচ রেলপথ তখন ৬৭৩'২১ মাইল।

(যুগান্তর সাময়িকী, মার্চ ১৯৪৯)

প্রাচীন মানুষের নূতন বিপদ

রবীন্দ্রনাথ যে সময় 'প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ' লিখেছিলেন, দেবতাদের বিপদ্ তার চেয়ে এখন অনেক গুণ বেশি বেড়ে গেছে। দেবতাদের অবস্থা এখন অত্যন্ত শোচনীয়। পৃথিবী-শাসনে তাঁদের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। দৈবনীতি এখন ধুলায় লুণ্ঠিত।

দেবতারা ছিলেন অজ্ঞ। তাঁদের কমনসেন্সের অভাব ছিল। বিদ্যা বিশেষ কিছুই ছিল না। কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, তাঁরা নিজ নিজ বিভাগ পরিচালনায় সিন্‌সিয়ার ছিলেন। তাঁরা মানুষের, বিশেষভাবে অনুগতদের, শুভার্থী ছিলেন। ভুল তাঁরা অনেক করেছেন, কিন্তু তাতে মানুষের কোনো গুরু অসুবিধে হয় নি।

দৈব শাসনে মানুষ এক রকম শান্তিতেই ছিল, এবং বহুদিনের অভ্যাসে এক-একটি বিষয়ের তারা এক-একটি বিশেষ ধারণা গঠন ক'রে তাকেই ধ্রুব মনে ক'রে মহানিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু আজ সে সব ধারণার মূলে আধুনিক 'সাধারণ জ্ঞান'-এর এমন এক-একটি ধাক্কা এসে লাগছে যে আজ প্রাচীন মানুষ সেদিনকার প্রাচীন দেবতাদের অপেক্ষাও অধিকতর বিপন্ন বোধ করছে।

আধুনিককালে আমাদের গৌরব এই যে, একালে জ্ঞানের পরিধি আমাদের বহু বিস্তৃত হয়েছে।

কথাটা খুবই ঠিক। এমন বিস্তৃত হয়েছে যে স্বয়ং সরস্বতী দেবী এর কূলকিনারা পাচ্ছেন না। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কোনো এক ইঞ্চি জায়গা বাকি নেই যেখানকার কিছু-না-কিছু তথ্য মানুষ সংগ্রহ করে নি। একদিকে ইলেকট্রোনিক মাইক্রোস্কোপ, অন্যদিকে প্যালোমার মানমন্দিরের দুই শ ইঞ্চি প্রতিফলকযুক্ত সর্বাধুনিক টেলিস্কোপ। (এর মধ্যে দেবতাদের বাসস্থান খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা এ বিশ্ব ত্যাগ ক'রে অন্য কোথাও গিয়ে থাকবেন)।

কিন্তু তথ্য-অবিষ্কারের ক্ষমতা তো শুধু এইসব বাইরের যন্ত্রে সীমাবদ্ধ নয়, আসল যন্ত্র রয়েছে মানুষের মগজে। সে যন্ত্রে বিশ্বের অনন্ত কোটি বিস্ময় এসে তাদের লিখন এঁকে যাচ্ছে। জ্ঞান এখন তাই বহু শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত। সামাজিক জীবনে শ্রেণীবিভাগ যত কমানো হচ্ছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেণীবিভাগের সম্ভবনা তত বাড়ছে—সম্ভাবনার ক্ষেত্র সীমাহীন। আগে যেমন বৃত্তি হিসেবে এক-একটি 'জাতি' তৈরি হয়েছিল, এখন জাতিভেদ তুলে দিয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং কাজের ক্ষেত্রে নতুন নতুন জাতি তৈরি হচ্ছে। না হয়ে উপায় নেই। বিশেষজ্ঞ না হ'লে কাজ চলে না। আর বিশেষজ্ঞ হ'তে হ'লে শিক্ষার গোড়া থেকেই শিক্ষার বিষয় ভাগ ক'রে দিতে হয়।

শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের প্রাচীন ধারণার উপর পর পর অনেক ধাক্কা লেগেছে, এখন আর আগের শিক্ষাকে চেনা যায় না। আগে প্রবেশিকা পাস ক'রে কলেজ। কলেজে আর্ট বা সায়েন্স। ধাপগুলো পর পর নির্দিষ্ট ছিল। সবার ছিল প্রায় এক ব্যবস্থা। অনেক ত্রুটি ছিল তাতে, কিন্তু তার একটা নির্দিষ্ট চেহারা ছিল। বাংলাদেশে যাঁরা টাকাকড়ির হিসেব সামলে ধনীরূপে, অথবা শিক্ষা ও চিন্তার ক্ষেত্রে মনীষীরূপে খ্যাত, তাঁরা সবাই ঐ একই শিক্ষা লাভ ক'রে নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন ক'রে গেছেন। বিদ্যাসাগর বা রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেন জন্মশিক্ষক, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

কিন্তু এখন গোড়া থেকেই বিশেষজ্ঞ চাই। দেশে কর্মীর চাহিদা। উপায় নেই। বিশেষ শিক্ষার অধিকার লাভের জন্য প্রবেশিকা পাসই যথেষ্ট। কোনো রকমে একখানা সার্টিফিকেট। ছেলেরা গোড়া থেকেই জানে তাদের বেশি পড়তে হবে না, অতএব পড়েই না। তাই পরীক্ষার আসনে ব'সে টোকা ভিন্ন উপায় নেই। টুকে পরীক্ষা দেওয়া এখন সাধারণ রীতি, এতে কেউ অবাক হয় না। কেউ বা অপরের লেখা কণ্ঠস্থ ক'রে তাই লিখে দিয়ে আসে। প্রশ্ন-পত্রে বুদ্ধির উপর লেশমাত্র দাবি থাকলে ছেলেরা জোট পাকায়, পরীক্ষা-ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, অনেক সময় দলবৃদ্ধির জন্য অন্যান্য কেন্দ্রে গিয়ে হানা দেয়। এ সবই শিক্ষা ব্যবস্থার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি। ছেলেদের এতে খুব বেশি দোষ নেই।

তাই পরীক্ষার আদর্শ ক্রমেই নিচুতে নামানো হচ্ছে। পাস মার্কও আগের চেয়ে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটিও এ ব্যবস্থার যুক্তিসঙ্গত পরিণাম। শিক্ষার মান নিচু করা এ যুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর শেষ শূন্যে গিয়ে দাঁড়াবে। হয়তো অবশেষে বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য ছাত্রবৃত্তির মানই যথেষ্ট মনে করা হবে, এবং সেকেণ্ডারি এডুকেশন শিক্ষাক্ষেত্রে হবে নিতান্তই সেকেণ্ডারি ব্যাপার।

বাংলাদেশে শিক্ষার মান মধ্যম ছিল বরাবরই। কিন্তু তাতে পূর্বযুগোচিত কিঞ্চিৎ আন্তরিকতা ছিল ব'লে তখন পাইকেরি হারে পাসের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আজকের তুলনায় শিক্ষিতের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি হ'ত। আজকের শিক্ষায় সাধারণ জ্ঞান নামক একটি বিভীষিকার আবির্ভাব ঘটাতে সে শিক্ষাটুকু চাপা প'ড়ে গেছে।

এই সাধারণ জ্ঞানই হচ্ছে প্রাচীন মানুষের নূতন বিপদ, অর্থাৎ আগের যুগের শিক্ষিতদের।

একদিকে পরমাণুর জগৎ, আর-একদিকে 'কোটি ছায়াপথ মায়াপথ'। সাধারণ শিক্ষিত লোকের এ দুইয়ের মধ্যবর্তী বিষয়ে একটি মোটামুটি ধারণা থাকলেই চলত। এখন চলে না। এখন হাজার রকম সারফেস নলেজ চাই। এখন শিক্ষার উদ্দেশ্য কি এ বিষয়ে অপ্রাপ্তবয়স্ককে রচনা লিখতে হয়, এবং শিখতে হয় হাইজীন, নইলে 'ব্যালান্সড' খাদ্য খেতে শেখে না, আলোহাওয়াযুক্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকতে শেখে না। আসলে ভালো বাড়িতে থাকতেও ইচ্ছে হয়, ভালো খাদ্য খেতেও ইচ্ছে হয়, কিন্তু ইচ্ছে হলেই হাইজীন পড়ে। জীবনের সঙ্গে জ্ঞানের এই বিচ্ছেদ ছেলেমেয়েদের এইভাবেই ঘটে। তারপর আধুনিক বিদ্যার হাওয়া গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ জ্ঞানের চিত্তাকর্ষক জগৎ।

এই সাধারণ জ্ঞানই এখন লোকের চোখে সম্মানযোগ্য আধুনিক জ্ঞান এবং আধুনিক বিদ্যার আদর্শ। তা ভিন্ন এ বিদ্যার কোথায়ও শেষ নেই ব'লে, এবং পথ চলতি ছিঁড়ে ছিঁড়ে সাজি ভরা যায় ব'লে, এতে বেশ একটা মোহ আছে। চাকরি চাইতে গেলেও এখন ডিগ্রীধারীকেও সাধারণ জ্ঞানের পরিচয় দিতে হয়। (জ্ঞানী ব্যক্তিমাত্রেই এই সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষায় ফেল করবেন)।

পৃথিবীর কোন্ জিনিসটি সর্বোচ্চ ; কোন্ জিনিসটি সর্বদীর্ঘ ; পৃথিবীর কোন্ দেশের প্রেসিডেণ্ট কে ; কে কোন্ আবিষ্কার প্রথম করে ; কে সাঁতার কাটতে প্রথম গায়ে চর্বি মাখে ; কে প্রথম জলে ডুবে আত্মহত্যা করে ; বা এই রকম সব অদ্ভুত অকেজো এবং সুলভ প্রশ্নোত্তরে সাধারণ জ্ঞান গড়া। এই সাধারণ জ্ঞানের সীমা সকল বিভাগে বিস্তৃত। প্রতি বিভাগের একটি বা দুটি কথা শিখলেই সাধারণ জ্ঞানের দাবি মেটে। এ বিদ্যা ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। প্রাচীন মানুষ বিস্মিত হয়ে ভাবে, কে জানত এমন জাহাজ-বোঝাই বিদ্যা ছেলেরা আয়ত্ত করবে!

আধুনিকতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে অন্যের সংগৃহীত উচ্ছিষ্ট উপকরণ নিয়ে এই জাতীয় বাড়াবাড়ি এ যুগের অপরিহার্য পরিণাম। পৃথিবীতে অদ্যাবধি বিজ্ঞানের যত আবিষ্কার বা যান্ত্রিক উদ্ভাবন, যে কারণেই হোক, তার সবই প্রায় পাশ্চাত্ত্য দেশের। এই আবিষ্কারী মনোভাব এক দেশ থেকে আর-এক দেশের লোকের মধ্যে ছড়ানো যায় কি না জানি না, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য নিয়ে একবার উঠেপ'ড়ে লাগলে হ'ত। রবীন্দ্রনাথ এ নিয়ে সারাজীবন অরণ্যে রোদন ক'রে গেলেন। ইস্কুলের ছেলেরাও কি ভাবে অন্যের লেখা মুখস্থ না ক'রে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজেরা কিছু দান রেখে যেতে পারে, এ পথেরও নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন। ছেলেরা সেই সব নির্দেশের নোট মুখস্থ ক'রে পরীক্ষা দেয়।

১৯২৩ সালে সম্ভবত অগস্ট মাসে, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের প্রয়োজন ঘটেছিল। সে সময় কথাপ্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় এম.এ. পড়া এবং পরীক্ষার রীতি সম্পর্কে আমার কাছে তিনি কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমাকে বলতে হয়েছিল, শুধু বই প'ড়ে এবং নোট মুখস্থ ক'রে পাস করা যায়। তা শুনে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ইস্কুলের পড়া আর এম. এ. পড়ার একই রীতি তিনি কল্পনা করতে পারেন না। মনে আছে খুব ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, 'চারুকে (চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে) অনেকবার বলেছি এ কথা, কিন্তু তার হয়তো ক্ষমতা নেই।'

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল মৌলিক গবেষণাজাত জ্ঞানের পরিচয়ে তবে এম এ. ডিগ্রী দেওয়া হোক।

সে কতদিনের কথা। আজ এম. এ. তে কি হয়েছে জানি না, তবে নিম্নশিক্ষা যে ক্রমে নিম্নতর হচ্ছে এ বিষয়ে এখন আর কারো দ্বিমত নেই।

একদা ইংরেজির কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছিল না প্রবেশিকা পরীক্ষায়। পরবর্তী কালে নামকরা সব ইংরেজি বই নির্দিষ্ট পাঠ্যরূপে ছাত্রের ঘাড়ে চেপেছে। তবু বলব তুলনায় আগের দিনেই ইংরেজি ভালো শিখত ছেলেরা। বহু পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট হওয়াতে এখন আর ইংরেজি শিখতে হয় না, কিছু নোট মুখস্থ করলেই পাস করা যায়, এমন কি সরলতম একটি বাক্য লিখতে না শিখেও।

প্রাচীন মানুষ এদের ইংরেজি বুঝতে পারে না, বিপন্ন বোধ করে। সবই তো 'সাধারণ জ্ঞান' থেকে। ভাষা শেখা আর কিছুতেই হয় না। না ইংরেজি, না বাংলা। বাঙালী শিশু বছর পাঁচেক বয়স পর্যন্ত বেশ বাংলা শেখে। তারপর ইস্কুলে যায় এবং ক্রমে বাংলা ভুলতে থাকে, এবং বেশি বয়সে একেবারেই ভুলে যায়। ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে হাতে ব্যাকরণ দিলে গোড়াতেই সব চুকে যেত।

একটি ইংরেজ শিশু তিন বছর বয়সে ভাষায় যেটুকু নিজেকে প্রকাশ করতে পারে, একজন বাঙালী ছাত্র পনেরো বছর ইংরেজি পড়েও সে ভাষায় নিজেকে ততটুকু প্রকাশ করতে পারে না। ইংরেজির কথা ছেড়েই দিলাম। বাংলাভাষায় নির্ভুল লেখা, কই, সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে (ইস্কুল কলেজের) তো আর দেখা যায় না। যাঁরা লেখক হতে চান তাঁদের মধ্যেও দুর্লভ। সাধারণ জ্ঞান সব বিদ্যাকে গ্রাস করতে চলেছে। সাঁতার কাটতে কে প্রথম গায়ে চর্বি মেখেছিল, জ্ঞানের রাজ্যে তার স্থান সর্বোচ্চ।

পল্লবগ্রাহিতার যুগ এটি। কথাটি অনেক কালের। শিক্ষার ক্ষেত্রে ওটি নিন্দনীয়। কিন্তু এখন যে আর ও ছাড়া গতি নেই। অন্যান্য দেশেও শিক্ষার মান এখন নিম্নগামী, কিন্তু এতটা নয়। তবু ওরা যদি ডালে ডালে বেড়ায়,

এরা বেড়াবে পাতায় পাতায়। সাঁতারে কে প্রথম গায়ে চর্বি মেখেছিল জ্ঞানরাজ্যের শেষ কথা।

জ্ঞান এত সহজ বলেই বাংলাভাষায় সামিয়িক পত্রের এত বাড়াবাড়ি। সংখ্যা সত্যিই অগুনতি। এটি আর এক বিপদ। অবশ্য প্রাচীন মানুষের। লেখা চায়, তাদের নতুন কাগজে ছাপবে। এ বিপদ থেকে কারো নিষ্কৃতি নেই। কেন নতুন কাগজ? জিজ্ঞাসা করলে তার কোনো উত্তর দিতে পারে না। নতুন কাগজের বক্তব্য কি, উদ্দেশ্য কি, উত্তর নেই। কোনো তরুণ সম্পাদকের এমন জোর দেখি নি যে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারে, আমাদের এই উদ্দেশ্য, এবং তার জন্য নতুন শক্তিমান লেখক ভিন্ন আর কারো লেখা ছাপব না।

সাধারণ জ্ঞান দেশের এই ক্ষতি করেছে। সাহিত্যপ্রীতি ভাষাপ্রীতি ও আন্তরিকতা—এ তিনের অভাব নিয়ে সাহিত্য পত্র প্রকাশ করার মূলে ঐ প্রথম চর্বি মাখা সাঁতারুর আদর্শ।

সাধারণ জ্ঞান হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানের ক্যারিকেচার, মর্কটবৃত্তি।

বিজ্ঞানীরা, দার্শনিকেরা, বিশ্বসৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনের সাধনা করছেন। বিশ্ব প্রথম সৃষ্টি কি ক'রে হ'ল, নক্ষত্র সৃষ্টি প্রথমে কি ক'রে হ'ল, বা পৃথিবী ও পরে প্রাণী ও পরে মানুষ সৃষ্টি কি ক'রে হল এই সব রহস্য আজও উদ্‌ঘাটিত হয় নি। প্রথম মানুষের আবির্ভাব নিয়ে বিজ্ঞানীরা মাথা খুঁড়ছেন, এরই ক্যারিকেচার হচ্ছে, কোন্ সাঁতারু প্রথম গায়ে চর্বি মেখেছিল তাকে খুঁজে বের করা।

এই-শিক্ষায়-শিক্ষিত এক ব্যক্তির লেখা একখানা বই পাঁচ ছ' বছর আগে বেরিয়েছিল। বইখানি বাংলা ছোট গল্পের সমালোচনা বিষয়ক। অতএব রবীন্দ্রনাথের গল্পের সমালোচনাও তাতে আছে। ২৫০ পৃষ্ঠার বই। কিছু নমুনা না দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না। জানি না হয় তো বইখানা কোথাও পাঠ্যরূপে এখনও চলে কি না। নমুনা—

১. একরাত্রি। মোট দু-লাইন উদ্ধৃতি ও চার লাইন সমালোচনা।

—"এই পংক্তি কয়টি হইতে মনে হয় যে হিন্দুবিবাহের নীতিতে রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।"

২. শুভদৃষ্টি। দশ লাইন সমালোচনা, তন্মধ্যে প্রধান বক্তব্য—"এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ বিবাহের শুভদৃষ্টি প্রথার বিরোধিতা করিয়াছেন এই স্থানে কবি বোধ হয় হিন্দুবিধান অপেক্ষা কোর্টশিপ প্রথার অনুকূলে।"

৩. শাস্তি। মোট সাত লাইন সমালোচনা। "কতকগুলি ক্ষেত্রে তাহারা (কৃষকেরা) যে কি রকম মারাত্মক রকমের অবিবেচক, তাহাও কবি দেখাইয়াছেন।"

৪. দালিয়া। মোট পাঁচ লাইন সমালোচনা। "গল্পটির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।" সমালোচক এ গল্পের নিজেই নাম দিয়েছেন ঐতিহাসিক গল্প, তারপর বলেছেন সন্দেহের অবকাশ আছে।

এই বইয়ের শেষে, যাঁদের নাম বইতে উল্লেখ করা হয় নি তাঁদের একটি তালিকা আছে। তার শিরোনামা "নব অঙ্কুরিত প্রতিভা"। এই নব অঙ্কুরিত প্রতিভার তালিকায় যাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে ষাট থেকে সত্তর বছরের অনেকে আছেন। যথা জগদীশ গুপ্ত, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বইখানায় লেখকের নামের পূর্বে অধ্যাপক কথাটি জোড়া আছে, তাতে বোঝা যায় 'সাধারণ জ্ঞান'-এর ক্ষেত্র ঊর্ধ্বদিকেও কম বিস্তৃত নয়।

রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গকৌতুকের কমলাসনা সরস্বতীকে আজ যদি প্রশ্ন করা যায়, "বিদ্যার এই অধোগতির মূলে আপনার দায়িত্ব কতখানি আছে তা প্রকাশ করুন", তা হ'লে কি ঘটবে তা অনুমান করা কঠিন নয়। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর পার্শ্বস্থ হাঁসটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে বলবেন, "ওকে জিজ্ঞাসা কর।" কিন্তু এ কথা শোনামাত্র বিপন্ন হাঁসটি উড়ে পালিয়ে যাবে এবং দেবীসরস্বতী মাথাটি নিচু ক'রে পদ্মের পাপড়ি ছিঁড়তে থাকবেন।

তার পর প্রহরখানেক গত হ'লে কম্পিত কণ্ঠে বলবেন, "সাধারণ জ্ঞান'-এর ক্রিয়া।"

(বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৯৫৭)

অপ্রিয় সত্য

আমরা বর্ত্তমানে দুর্মুখ বলতে একটি নিন্দাযোগ্য চরিত্র বুঝি। যে লোকটি ইচ্ছে ক'রে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিনা প্রয়োজনে অপ্রিয় কথা শোনায় তাকে অনেক সময় আমরা দুর্মুখ বলি।

রামায়ণে দুর্মুখ বলতে যাকে বোঝাত তাঁর নাম ছিল ভদ্র। ভদ্রের দুর্মুখ নামটি ভবভূতির উত্তররামচরিতম্ নাটকে পাওয়া যায়। এই ভদ্র বা দুর্মুখ ছিলেন রামের নিযুক্ত গুপ্তচর বা ইনফর্মার। ইনি এমন নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত যে অতি গুরুত্বপূর্ণ খবরও তাঁর মুখের কথায় বিশ্বাস করা হ'ত, তার সত্যতা অন্যভাবে যাচাই করবার প্রশ্নই উঠত না। সীতা সম্পর্কে প্রজাদের মনোভাব রামের কাছে অন্য কেউ বললে সে কথা বিশ্বাসযোগ্য হ'ত কিনা সন্দেহ। খবর যত অপ্রিয়ই হোক তবু দুর্মুখ তা গোপন করবেন না, এই দুরূহ কর্তব্য ছিল তাঁর।

উত্তররামচরিতে রাম বলছেন, "দুর্মুখ অন্দরের পরিচারক; আমিই তাকে নগর ও পল্লীবাসীদের মধ্যে গুপ্তচরের কাজ করতে পাঠিয়েছিলাম।"

দুর্মুখ অবশ্য তাঁর সংগৃহীত সেই নিষ্ঠুর খবরটি রামের কানে কানে বলেছিলেন, প্রকাশ্যে উচ্চারণ ক'রে বলতে পারেননি।

প্রাচীন যুগে সকল গুপ্তচরেরই কর্তব্য ছিল দুর্মুখের সমান। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে যাদের গূঢ়পুরুষ বলা হয়েছে তারাও অনেকটা দুর্মুখের সমধর্মী। গুপ্তচরবৃত্তি এবং ছদ্মবেশ ধারণের বহু বিচিত্রতার পরিচয় পাওয়া যায় কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে। এদের অনেক অর্থ ও সম্মানের দ্বারা উৎসাহিত করা হ'ত।

কর্তব্যের খাতিরে, নিজে ব্যথিত হয়ে অন্যকে অপ্রিয় সত্য শোনাবার মতো লোক এখনও আছে, যদিও তাদের সংখ্যা কম। কিন্তু দুর্মুখ বলতে এখন যাদের বোঝায়, অর্থাৎ যারা দম্ভ প্রকাশ ক'রে ব'লে বেড়ায়—'সত্যি বলতে ভয় পাই না মশায়, যা বলব মুখের উপর বলব'—তাদের সংখ্যা কিছু বেশি।

প্রাচীন কালে 'মুখের উপর সত্য বলা'র আর একটি ভাল দৃষ্টান্ত আছে। সে যুগে যখন রাজাই ছিলেন সর্বময় প্রভু, আধুনিক গণতন্ত্রের মতো কোনো বিরোধী পক্ষ ছিল না, তখন রাজ দরবারে একজন ক'রে বিদূষক পালন করা হ'ত।

শেক্সপীয়ারের কল্পনাতেও রাজা লিয়ারের সঙ্গে একজন 'ফুল' স্থান পেয়েছিলেন। সংস্কৃত নাটকে বিদূষকের দেখা পেয়েছি, এমন কি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড় নামক এক বিদূষককে পালন করা হয়েছে, এমন জনশ্রুতি আছে। গণতন্ত্রের বিরোধী পক্ষের মতোই এঁদের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে শাসকদের মুখের উপর অপ্রিয় সত্য বলবার। এঁদের আমরা ভালবাসি, তার কারণ এঁদের আক্রমণে হিংসা বা ঈর্ষা নেই, আছে একটি সরল ও উদার কৌতুক-মণ্ডিত স্নিগ্ধতা। এঁরা আসলে জ্ঞানী ব্যক্তি। অভিজ্ঞতা, বহুদর্শিতা ও উদারতার সাহায্যে এঁরা বিষয়ী ব্যক্তির জীবন দর্শনের অসঙ্গতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তাই এঁরা সকলের প্রিয়। বিদূষক এই ভাবে যাঁকে আক্রমণ করেন তিনিই তাঁর বড় বন্ধু।

সাহিত্যে যেমন দুর্মুখ আছে, সাহিত্যিকদের মধ্যেও তেমনি দুর্মুখের অভাব নেই। এঁদেরও আমরা ভালবাসি। ভোলটেয়ার, ডক্টর জনসন, মার্ক টোয়েন বা বারনার্ড শ এঁরা সবাই আমাদের প্রিয় দুর্মুখ। এঁদের আক্রমণের লক্ষ্য ব্যাপক, কিন্তু মাঝে মাঝে ব্যক্তিবিশেষকেও আক্রমণ ক'রে থাকেন। এঁরা সত্যও বলেন অপ্রিয়ও বলেন, কিন্তু তবু সেই ভাষণে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থাকে না বলেই তা কাউকে আঘাত করে না। বরং তাতে ব্যক্তির বা সমাজের কল্যাণ হয়।

মার্ক টোয়েন তাঁর এক কল্পিত কাহিনীর মাধ্যমে একটি ঘটনা বিবৃত করেছেন :

এক ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্টের একটা চোখ ছিল কৃত্রিম, কাঁচের তৈরি। সেই চোখটি প্রস্তুত করেছিলেন প্যারিসের এক শ্রেষ্ঠ কারিগর। উক্ত প্রেসিডেণ্টের গর্ব ছিল এই যে তাঁর সেই চোখের কৃত্রিমতা কেউ ধরতে পারবে না। একদিন

তিনি মার্ক টোয়েনকে বললেন—"টোয়েন, তুমি বলেছ তোমার ৫০০০ ডলার দরকার, এই টাকা আমি তোমাকে দেব, কিন্তু তোমাকে বলতে হবে আমার কোন্ চোখটা কাঁচের।"

মার্ক টোয়েন তৎক্ষণাৎ বললেন, "কেন, আপনার বাঁ চোখটা। কারণ একমাত্র ঐটিতেই কিছু পরিমাণে দয়া-মায়ার আভাস ফুটেছে।"

ডক্টর জনসন লর্ড চেস্টারফিল্ডকে তাঁর পৃষ্ঠপোষকের আসনে বসিয়ে যে বিড়ম্বনা ভোগ করেছিলেন তা তাঁর লেখা একখানা চিঠি থেকে জানা যায়। এই চিঠিখানা অপ্রিয় সত্য ভাষণের জন্য সাহিত্য জগতে বিখ্যাত হয়ে আছে।

লর্ড চেষ্টারফিলড যখন ডক্টর জনসনের অভিধানকে প্রশংসা করলেন, তখন ডক্টর জনসন সে প্রশংসাকে এই ব'লে প্রত্যাখ্যান করলেন যে সে প্রশংসা এখন তাঁর দরকার নেই। তিনি লিখলেন: "মাই লর্ড, আপনার বাইরের ঘরগুলোয় যখন আমি আপনার অপেক্ষায় ব'সে থাকতাম, তখন থেকে সাত বছর পার হয়ে গেছে। সে সময় কতবার সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছি। আমি নিজের চেষ্টায় অভিধান প্রকাশের আয়োজন শেষ করার আগে পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে কণামাত্র সাহায্য পাইনি, একটি উৎসাহ বাক্য শুনিনি, একবিন্দু অনুগ্রহ আমার উপর বর্ষিত হয়নি।...মাই লর্ড, পৃষ্ঠপোষক কি তাঁকেই বলে না যিনি জলেপড়া লোকের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, তারপর যখন সে ডাঙায় পৌঁছয় তখন সাহায্য দিয়ে তাকে বিব্রত করেন?"

বিজ্ঞানী গ্যালিলিও "পৃথিবী সূর্যের চার দিকে ঘোরে" এই অপ্রিয় সত্য প্রকাশ ক'রে একদিন বড়ই বিব্রত হয়েছিলেন। এমন কি গুরু শাস্তির ভয়ে তাঁকে কথা ফিরিয়ে নিতে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ অনেক অপ্রিয় সত্যই মধুর ভাবে বলেছেন, কদাচিৎ রূঢ় ভাবেও বলেছেন। নোবেল প্রাইজ পাবার পর অভ্যর্থনা উপলক্ষে, নাইট উপাধি ত্যাগ উপলক্ষে, এবং আরও অনেক উপলক্ষে কঠোর সত্য বলেছেন;

কাউকে গ্রাহ্য না ক'রে, মহাত্মা গান্ধী অপ্রিয় সত্য ভাষণের জন্য সবার প্রিয় ছিলেন।

আগে বলেছি অকারণ গায়ে প'ড়ে অন্যকে আঘাত দেবার জন্য যারা নিষ্ঠুর কথা বলে তারা অনেক সময় লাঞ্ছনাও ভোগ করে। এই উদ্দেশ্যেই দুর্মুখ-জাতীয় লোককে উপদেশ দিয়ে এক রসিক ব্যক্তি বলেছেন—"কোনো পেশীবহুল জোয়ান জবরদস্ত মিথ্যাবাদীকে কখনো নিজে দুর্মুখের ভূমিকায় নেমে মিথ্যাবাদী বলো না; সে যে মিথ্যাবাদী এ বিষয়ে তোমার যদি সন্দেহ না থাকে, তা হ'লে অন্য কোনো লোককে ভাড়া ক'রে এনে, কথাটা তাকে দিয়ে বলিও।"

(মেদিনীপুর পত্রিকা, ১৯৫৫)

ক্যানিং স্ট্রীট

এক কথায় অন্য কথা মনে পড়ে—যেমন ক্যানিং স্ট্রীট সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই আগে মনে পড়ে মেয়েদের কথা। মনে পড়ার দুটি কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে কলকাতা শহরের মধ্যে এই একটি মাত্র অতি বিখ্যাত এবং অতি প্রাচীন পথ, যা শহরের অধিকাংশ মেয়ে দেখেনি। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে—বিশেষ ভাবে মেয়েদের নিত্য প্রয়োজনীয় অধিকাংশ প্রসাধন-বিলাসের জিনিস, শহরের অন্যান্য অংশে এবং শহরের বাইরে এখান থেকেই সরবরাহ হয়। মাথার কাঁটা, গন্ধ দ্রব্য, সাবান, তেল, আয়না, চিরুনি, চুড়ি, পাউডার, স্নো, ক্রীম, লিপস্টিক ইত্যাদি এখানে পাইকেরী হিসেবে বিক্রি হয়। অবশ্য শুধু মেয়েদেরই নয়, সবারই ব্যবহার্য নানা জিনিস এখানে পাওয়া যায়। স্টেশনারি জিনিস যেমন খাতাপত্র কালি কলম কাগজ পেন্সিল এবং অফিসের যাবতীয় সামগ্রী। তা ভিন্ন পেটেণ্ট ওষুধ, অ্যালুমিনিয়ামের জিনিস, চীনা মাটির পাত্র, কাঁচের পাত্র, ছুরি কাঁচি, তালাচাবি, টর্চ, ব্যাটারি, গুঁড়ো দুধ, জমানো দুধ ইত্যাদি হাজার রকমের জিনিস স্বদেশী বা বিদেশী পাওয়া যায় ক্যানিং স্ট্রীট এলাকায়।

এখানে পাইকেরী ভিন্ন বিক্রি নেই, তাই এখানে যাবতীয় ব্যবসায়ী-ক্রেতার ভিড়। সমস্ত ক্যানিং স্ট্রীট অঞ্চল বলতে অনেকখানি জায়গা বোঝায়। ক্যানিং স্ট্রীটের সঙ্গে এজরা স্ট্রীট, আমড়াতলা স্ট্রীট, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট ইত্যাদি মিলিয়ে এক বিরাট নিরেট নিত্য হাট। এখানে অন্তরঙ্গতা বা আত্মীয়তা নেই, অন্তত প্রকাশ্যতঃ নেই। এখানে সম্পর্ক শুধু ক্রেতা ও বিক্রেতা। তাই এখানে সবাই ব্যস্ত। এখানকার কোনো পথেই নিশ্চিন্ত মনে কারো চলবার উপায় নেই, সর্বত্র ঠেলাঠেলি। সরু পথ, তার মধ্যে হাজার হাজার লোক, আর তার ফাঁকে ফাঁকে লরি, ট্যাক্সি, রিক্সা, সাইকেল, ঠেলা গাড়ি, ঘোড়াগাড়ি, গোরুর গাড়ি। ষাঁড়ও দু একটি দেখা যায়। এই সবের যোগাযোগে এখানকার পথচারীদের মনের গতি ও পায়ের গতি বিপরীত ধর্মী। মন ছুটছে কিন্তু পা ছুটতে পারছে না। গোরুর গাড়ি আর মোটর গাড়ি এখানে সমান। সবারই ধীর গতি, কিন্তু অলস গতি নয়। পথচারী সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছে আত্মরক্ষায়, আর গাড়ির চালক প্রাণপণ

চেষ্টা করছে দুর্ঘটনা এড়াবার। তাই এই পথে দায়ে প'ড়ে শুধু ক্রেতারাই আসে, বিলাসীরা আসে না, বিলাসিনীরা তো এ পথের নামই জানে না। অথচ তারা একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে তাদের প্রসাধন-প্রসন্নতা শুধু নয়, মিলন বিচ্ছেদ মান অভিমানও নির্ভর করে এই ক্যানিং স্ট্রীটের উপর।

শহরের ব্যবসা কেন্দ্রের ধমনীর মতো ক্যানিং স্ট্রীট লোয়ার চিৎপুর রোড থেকে, অর্থাৎ যেখানে কলুটোলা স্ট্রীট শেষ হ'ল তার বিপরীত দিক থেকে, পশ্চিম দিকে হুগলী নদীর ধারে স্ট্র্যাণ্ড রোডে গিয়ে শেষ হয়েছে। মাঝ খানে বড় রাস্তা একে কেটে চলে গেছে। এই রাস্তার নাম নেতাজী সুভাষ রোড, পূর্ব নাম ক্লাইভ স্ট্রীট। এই রাস্তাটি একে শুধু দেহের দিক দিয়েই খণ্ডিত করেনি, চরিত্রের দিক দিয়েও খণ্ডিত করেছে—যা নতুন রাস্তা ব্রেব্রোর্ন রোডও করতে পারেনি। কারণ নেতাজী সুভাষ রোডের পশ্চিম অংশে ক্যানিং স্ট্রীটের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে পথের দু পাশে অভিজাত সৌধ শ্রেণী—বড় বড় সওদাগরী অফিস, এখানে পথ প্রশস্ত, এবং একধারে সারবন্দী সব মোটর কার ছবির মতো সাজানো।

ক্যানিং স্ট্রীট ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জায়গায় অবস্থিত। এই এলাকার দক্ষিণ দিকে রাইটার্স বিলডিং। সেণ্ট অ্যানড্রুজ গীর্জা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেইখানে ছিল ইংরেজদের প্রথম যুগের আদালত গৃহ বা সুপ্রীম কোর্ট। ১৭৭৫ থেকে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল তার আয়ু। এই আদালতে মহারাজ নন্দকুমারের বিচার হয়েছিল। আর লালদীঘি ছিল তখন জলের একটা বড় সরবরাহ কেন্দ্র। সকাল ছ'টা থেকে দশটা, বাহকদের ভিড় লেগেই থাকত, তারা এখান থেকে জল নিয়ে বিক্রি করত। ক্যানিং স্ট্রীট এলাকার পশ্চিম দক্ষিণ দিকে লালদীঘি ও রাইটার্স বিলডিং-এর পশ্চিমে অবস্থিত প্রথম যুগের ফোর্ট বা কেল্লা। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তৈরি শুরু হয়ে এইফোর্ট শেষ করতে ১৭ বছর লেগেছিল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলার বাহিনী কলকাতা আক্রমণ ক'রে এটিকে প্রায় বিধ্বস্ত করে। এর ভগ্নাবশেষ সরানো হয় এর প্রায় ৫৬ বছর পরে। তারপর এখানে কাস্টম হাউস তৈরি হয়।

ক্যানিং স্ট্রীট এলাকার ব্যবসা কেন্দ্র উত্তরে হ্যারিসন রোড পর্যন্ত বিস্তৃত। একদিকে ডালহৌসি স্কয়ার, আর একদিকে হ্যারিসন রোড—এই দুয়ের ঠিক মাঝখানে—ক্যানিং স্ট্রীট বিশ্বভারত এবং বিশ্বমানবের বাণিজ্যতীর্থরূপে প'ড়ে আছে।

ক্যানিং স্ট্রীটের পূর্ব নাম কি ছিল তা জানা যায় না, তবে এই রাস্তা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক ৫ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা ব্যয়ে পাকা করা হয়—তার ইতিহাস আছে। যাঁর নামে পথ তিনি ছিলেন সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের প্রখ্যাত গভর্নর। তিনি বিদ্রোহীদের উপর প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের প্রতি কিছু সদয় ব্যবহার করেন। এ জন্য বিলেতে বিদ্রূপ ক'রে ক্যানিংকে বলা হয় Clemency Canning। কিন্তু পরাজিত বিদ্রোহীদের প্রতি ক্যানিং-এর এই ব্যবহার মানব-প্রীতি ঠিক নয়। এটাই ছিল তাদের স্থায়ীভাবে শান্ত করার একমাত্র কৌশল। ইংরেজের কাছে এজন্য ক্যানিং পরে প্রশংসা লাভ করেন। সুতরাং তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য ইংরেজদের আদি আড্ডার কাছেই তাঁর নামে রাস্তা হওয়া স্বাভাবিক।

ক্যানিং স্ট্রীটের সবচেয়ে প্রাচীন চিহ্ন হচ্ছে এখানকার আরমেনিয়ান গীর্জা। ক্যানিং স্ট্রীটের উত্তর দিকে অবস্থিত। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে ২২৯ বছর আগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। লিয়ন গাঙানো নামক এক আরমেনিয়ন এঞ্জিনিয়রকে পারস্য দেশ থেকে এই গীর্জা তৈরির জন্যে আনা হয়। আজ দুই শতাব্দী ধ'রে এই গীর্জা তাঁর কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। আর একটি প্রাচীন গ্রীক গীর্জা আছে আমড়াতলায়। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে এটি তৈরি শুরু হয়।

ক্যানিং স্ট্রীট এলাকার এক অংশের নাম মুর্গীহাটা। ইউরোপীয়ানদের আদি ঘাঁটি ছিল এই এলাকায়—তাই এইখানেই ছিল তাদের মুর্গীর হাট। এখন আর এখানে মুর্গী নেই। কিন্তু মুর্গী না থাক, লেডিকেনি অবশ্যই আছে—এবং ওটাই এখন সান্ত্বনা। (হসন্তিকা, ১৯৫৩)

বিপিন চৌকিদার ও আমি

জীবনটাকে যত গুরুভাবেই গ্রহণ করি না কেন, তবু এরই মধ্যে কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি মাঝে মাঝে এসে গুরুত্ব ভেঙে দিয়ে সব ভার লঘু ক'রে দিয়ে যায়। জীবন সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত ধারণাই সম্ভবত এর জন্য দায়ী। আমরা মনে করি যা আমরা চাই তা পাব, যে পথে চলেছি সে পথ আমাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে, যা ঘটা আমাদের মতে সম্ভব তা এ সংসারে নির্ঘাত ঘটবে।

কিন্তু অগণিত বাইরের ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আবর্তে আমরা সর্বদা নিজেদের নিক্ষেপ ক'রে রেখেছি, তাই আমরা যা চাই তা হবে কেন? অপ্রত্যাশিত এবং অবাঞ্ছিত বাধা আচম্বিতে এসে আঘাত করে। আর সেই আঘাতে কখনো ভেঙে পড়ি, কখনো তার অসম্ভাব্যতায় কৌতুক অনুভব করি। সামান্য একটু মাত্রার তফাৎ। সেই মাত্রা একটু এদিক ওদিক হলেই ক্রন্দন কৌতুকে পরিণত হয়।

ক্রন্দনের ইতিহাসে জগৎ পূর্ণ, জীবন পূর্ণ। আর তা প্রায় সবার জীবনে সমান। অথচ মজা এই যে মানুষের জীবনে কৌতুকের দেবতা সর্বদা ওরিজিন্যাল, তাঁর পথ স্বতন্ত্র, মানুষের জীবন নিয়ে সব সময় নতুন কিছু করার দিকে তিনি অতিমাত্রায় সচেতন। তাই মানুষের দুঃখ সবার প্রায় এক, কিন্তু সেই দুঃখ যখন তার জীবনে কৌতুকরূপে দেখা দেয় তখন তার চেহারা মৌলিক।

জীবনের পিছন দিকে চাইলে বাল্যকালের এমনি একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। এখন আমার মনে হয়, এই ঘটনাটি আমার পরবর্তী সাহিত্য জীবনের উপর বিশেষ একটি প্রভাব বিস্তার করেছিল। ক্রন্দনই যে বিশেষ অবস্থায় কৌতুকে পরিণত হয়, এ শিক্ষা আমি এই ঘটনা থেকেই পেয়েছি ব'লে আমার বিশ্বাস। একটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা হঠাৎ মনকে আঘাত করলে তা যে কৌতুকের সীমানাতেও যেতে পারে এ তথ্য তখন না বুঝলেও আমার অজ্ঞাতসারে সেটি আমার মনে নিশ্চয় ক্রিয়া করেছে।

ঘটনাটি বাইরের দৃষ্টিতে অতি সাধারণ অবশ্যই। কিন্তু তার গৌণ মূল্য আমার জীবনে কম নয়।

আমার মাতুলালয় ছিল ফরিদপুর জেলার রতনদিয়া গ্রামে। ছোট্ট গ্রামখানি, কিন্তু এমন সুন্দর সাজানো গ্রাম আমি খুব কম দেখেছি। প্রত্যেকটি পরিবারের রুচিবোধ ছিল প্রশংসনীয়, আর তার ফলে সবাই যেন প্রতিযোগিতা ক'রে কে কার বাড়ি কত সুন্দর করতে পারেন তার চেষ্টা করতেন। ফুলের বাগান, ফলের বাগান, সবই চমৎকার পরিকল্পনায় সাজানো।

১৯১৩ কিংবা ১৪ সালের কথা বলছি। গ্রামে শিক্ষিত এবং আধুনিক মনোভাবাপন্ন লোকের অভাব ছিল না। লেখক রবীন্দ্রনাথ মৈত্র তখন সেখানে বাস করতেন। বাইরের বড় বড় শহরে পড়া স্কুলের ছেলেরা ছুটির মধ্যে এসে এখানে একত্র হত, আমিও অধিকাংশ ছুটি এখানেই এসে কাটাতাম। (পরে ১৯১৬ থেকে এখানেই আমাদের স্থায়ী বাসস্থান হয়েছিল)। আমাদের মধ্যে খেলাধুলা, সাঁতার কাটা প্রভৃতি কাজে বেশ উৎসাহ ছিল। হাতে লেখা মাসিকও একটা বের করা হয়েছিল।

দুষ্টুমি বুদ্ধিরও অনেক খেলা চলত আমাদের মধ্যে। নারকল গাছ প্রায় সবার বাড়িতেই ছিল। আমাদের মধ্যে গ্রীষ্মকালে ডাব চুরি ক'রে গ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত চন্দনা নদীর ধারে ব'সে খাওয়া চলত। কিন্তু এ খাওয়াটা নিতান্তই ছিল একটা খেলার ব্যাপার, কেননা যত ডাব আনা হ'ত তত খাওয়া সম্ভব ছিল না, অতএব নষ্ট হ'ত অনেক। কিন্তু তখন এই নষ্টকে আমরা কেউ নষ্ট ব'লে মনে করি নি, কারণ সেখানে ডাব ছিল অত্যন্ত সুলভ। এ শুধু চুরির আনন্দে চুরি, অন্ধকারে হাতেকলমে রহস্যসৃষ্টি এবং পরদিন তা সগৌরবে প্রচার করার উৎসাহে চুরি।

একদিন কথা হ'ল সেকালে যেমন আগে চিঠি দিয়ে জানিয়ে ডাকাত পড়ত, আমরাও তা করি না কেন।

শৈলেন চাটুজ্যেকে (এখন সে জীবিত নেই) আগেই জানিয়ে দেওয়া হ'ল, আজ রাত্রে তোমাদের কোনো একটি বিশেষ গাছ ডাবশূন্য

হবে ব'লে মনে হচ্ছে। শৈলেন বলল, অসম্ভব, আমি জেগে থাকব, ধ'রে ফেলব।

কথাটা ঐখানেই শেষ হ'ল।

চিঠি দিয়ে ডাকাতি করায় বাহাদুরি আছে বটে, কিন্তু ঝক্কিও কম নয়। কারণ এবার আমাদের সাধারণ রীতির বাইরে যেতে হল, ঠিক করলাম গভীর রাত্রে চুরি করতে হবে। আমরা জানতাম আমাদের সাধারণ চুরির সময় ৯টা ১০টা পার হয়ে গেলেই শৈলেন ঘুমিয়ে পড়বে। বড় জোর ১১টা পর্যন্ত জেগে থাকবে। অন্য বাড়ির ডাব চুরির ব্যাপারে সে অনেকবার আমাদের সঙ্গী হয়েছে, তার অজানা ছিল না কিছু।

শচীন গাছে উঠবে, তারই বাড়িতে আমরা চার পাঁচ জন শুয়ে শুয়ে গল্প করছি। রাত সম্ভবত ১টা। গ্রামের উত্তর সীমাসংলগ্ন রেল লাইন দিয়ে ঢাকা প্যাসেঞ্জার চলে গেল।

গাড়ি সেদিন সম্ভবত লেট ছিল, ঘড়ি ছিল না কারো, রাত দুটো হয়েছে ব'লে মনে হ'ল। এ সময়ে কেউ জেগে নেই এ বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না। সমস্ত গ্রামখানা মেঘেঢাকা অন্ধকার আকাশের নিচে একটি প্রকাণ্ড কালো জন্তুর মতো ঘুমিয়ে আছে। গাড়ি চ'লে যাওয়ার পর আর কোনো শব্দ নেই কোথায়ও। এমন নীরব নীরন্ধ্র আবেষ্টনে দিনের বেলার আদর্শবাদী স্কুলের ছাত্র আমরা বন্ধুর বাড়িতে ডাব চুরি করতে যাচ্ছি এইটিই তো যথেষ্ট কমিক, কিন্তু জানতাম না কৌতুকবিধাতা স্বতন্ত্র কিছু সেদিন সঞ্চিত রেখেছিলেন এর পরেও।

শচীন যথারীতি কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে গাছে উঠে গেল। একটা লম্বা দড়ি, একপ্রান্ত শচীনের কোমরে, আর এক প্রান্ত আমাদের হাতে, (কাঁদিসুদ্ধ পাড়ার এইটিই সহজ রীতি, এতে শব্দ হয় না), আর একখানা দা, সেও কোমরে গোঁজা।

বেশ সাফল্যের সঙ্গে প্রাথমিক পর্ব সমাধা হল। বুকের মধ্যে দুরু দুরু করছিল, কি জানি যদি জেগেই থাকে। দম বন্ধ ক'রে সমস্ত প্রক্রিয়াটি

উত্তীর্ণ হচ্ছি। শচীনকে আর দেখা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঁদির গোড়ায় কোপ পড়ার শব্দ। দ্রুত কোপ নয়, প্রত্যেকটির পর কান পেতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা, কেউ চেঁচায় কিনা। দশ পনেরো সেকেণ্ড পরে ঠুক ক'রে আর একটি কোপ।

মিনিট দুই-এর মধ্যেই দড়ি কাঁপতে লাগল। ওটা হচ্ছে আমাদের প্রান্তের দড়ি শক্ত ক'রে ধরার ইঙ্গিত। অর্থ : কাঁদি এবার দড়ির পথে নিচে নামবে।

সাফল্যের কিনারায় এসেছি। একমাত্র ভয় সাপের। কিন্তু কখনো দুর্ঘটনা ঘটে নি ব'লে সাপের বিষয়ে ততটা সীরিয়াস নই।

ডাব নেমে এলো। বড় কাঁদি নয়। মাত্র সাত-আটটি। উপর থেকে দড়ি খুলে দিল শচীন। কিছুক্ষণ কান পেতে রইলাম।

দড়ির শব্দেও কেউ জাগল না। শচীনের নেমে আসার খস খস শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর কয়েক সেকেণ্ড মাত্র।

শচীন মাটিতে সবেমাত্র পা দিয়েছে।

এমন সময় পথে, আমাদের থেকে হাত পাঁচ-ছয় দূরে ধমকানির শব্দ—"কে ওখানে ?"

ভয়ে চোরের মতো সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম। সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে গেছে, গায়ে ঘাম ঝরতে আরম্ভ করেছে—কণ্ঠস্বর পরিচিত যে !

এ কণ্ঠস্বর বিপিনের। সে গ্রাম্য চৌকিদার। রাত্রে পাহারা দিয়ে ফিরছে।

যে-কোনো চুরি উপলক্ষে দারোগা এলে বিপিনকে মাথায় লাল পাগড়ি, গায়ে ঘননীল জামার উপরে চারপাশ আঁটা অবস্থায় দেখেছি। কি কর্মতৎপর, কি ক্ষমতা। ইংল্যাণ্ডের রাজার সঙ্গে বাংলার গ্রাম্য চৌকিদার এক আত্মীয়তা-বন্ধনে বাঁধা। তাকে কে না ভয় করে, বিশেষ ক'রে তার কর্তব্যরত অবস্থায়।

থানায় চালান হয়ে যাব এ বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। হৃৎপিণ্ডে পুনরায় হাতুড়ির ঘা মেরে কানের কাছে বিপিন চৌকিদার চেঁচিয়ে উঠল—"কে ওখানে ?"

শচীন তখন মরীয়া। পালাবার পথ নেই। সে সাহস ক'রে এগিয়ে এসে কৃত্রিম হাসি হেসে বলল, "এই আমরা দুটো ডাব পাড়ছি আর কি।"

অপরাধী অপরাধ স্বীকার করেছে। আমার তো চিন্তার ক্ষমতা সম্পূর্ণ লুপ্ত। রাত ৯টা-১০টায় ডাব পাড়া ছিল খেলা, কিন্তু রাত দুটোয়—এ তো রীতিমতো আনুষ্ঠানিক চুরি, আইনসঙ্গত চুরি। একে খেলা ব'লে ওড়ানোর উপায় নেই। রাত দুটোয় চুরি এবং চৌকিদার ধরেছে। আসামী হয়ে চালান যাব, এর বেশি আর তখন কিছু ভাবতে পারছি না। মামাবাড়ির দেশে হলেও চৌকিদারের কাছে মামাবাড়ির আব্দার বৃথা হবে জানি। তাই এত ভয়।

কিন্তু কি হ'তে কি হ'ল। শচীন যখন এগিয়ে এসে শুকনো গলায় বলল "এই দুটো ডাব পাড়ছি আর কি," তখন বিপিন চৌকিদার তাকে ধরল না, তার কোমরে দড়ি বাঁধল না, কাতরভাবে বলল, "তাই নাকি, তা হলে আমাকেও একটা দেবেন, বাবু।"

একজন শ্রদ্ধেয় চৌকিদার বলছে—"আমাকেও একটা দেবেন, বাবু।" বালকমনের একটি দৃঢ়মূল বিশ্বাসের উপর কি প্রচণ্ড আঘাত। সমস্ত ধারণা এলোমেলো হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

তখন, সেই মুহূর্তে, এর প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট বুঝতে পারি নি। ডাব তাকে দুটো দেওয়া হয়েছিল। সবগুলো দিতে পারলেই ধন্য হতাম। কিন্তু সমস্ত মিটে গেলে কি উপভোগই না করেছিলাম ঘটনাটি। এর পর থেকে এর কমিক রূপটি ক্রমেই আমার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল, এবং আমার বিশ্বাস, এই ঘটনাই অজ্ঞাতসারে আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুন পথে চালিত করেছে।

মূলে বিপিন চৌকিদার।

(কথাসাহিত্য ১৯৫৬)

বিভূতি ভূষণ

মাত্র পাঁচ বছর আগের কথা বিভূতিবাবু আমাদের বাড়িতে এসে নানা রকম গল্প করছেন। আমার কি মনে হ'ল, তাঁকে বল্‌লাম, আপনার ছেলে বেলার কথা কিছু বলুন। বিভূতিবাবু বিনা ভূমিকায় তাঁর বাল্য-কাহিনী বলতে শুরু করলেন চ খেতে খেতে। আমি পেন্সিল নিয়ে বসলাম—কথায় কথায় বাল্যকাহিনী বহুদূর এগিয়ে গেল।

ভাগ্যের পরিহাস! পাঁচ বছর পরে সেই কাহিনী লিখতে বসেছি তাঁর মৃত্যুর পরে।

অনেক বছর ধ'রে, বিভূতিবাবুকে নানাভাবে, বিভিন্ন পটভূমিতে, অন্তরঙ্গ-ভাবে জানবার সুযোগ হয়েছিল আমার। অবশ্য এমন সুন্দর মানুষটিকে অন্তরঙ্গভাবে জানবার সুযোগ আমার একারই ঘটেনি, কেননা তিনি ছিলেন সবার কাছেই সুলভ। তাঁর কোনো দাম্ভিকতা ছিল না, তিনি সব সময়েই তাঁর চারপাশে এমন একটি শুচিশুভ্র মধুর আবহাওয়া বয়ে নিয়ে বেড়াতেন যার সংস্পর্শে এলে মন নন্দিত হ'ত। কারো প্রতি কোনো ঈর্ষা নেই, কারো বিরুদ্ধে একটি নিন্দাবাক্য নেই, পরম উৎসাহের সঙ্গে তাঁর দেখা কোনো দেশের কাহিনী বলতে শুরু করতেন, অথবা এমন কোনো কথা যা কারো ব্যক্তিগত নয়, সবারই। তাই কোনো একা ব্যক্তি একান্তভাবে তাঁকে পায়নি, সবাই তাঁকে সমানভাবে পেয়েছে।

তাঁর মধ্যে এমন একটি ধর্ম ছিল যাকে দুর্লভ বলা চলে। সেটি তাঁর আত্ম-ক্ষমতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস। সেখানে কোনো ফাঁকি ছিল না, আর ঠিক এই কারণেই হিংসা, দ্বেষ, শঠতা, ঈর্ষা প্রভৃতি তাঁর জীবনে প্রয়োজন ছিল না।

তাঁর চরিত্রের একটি দিক যেন শিশুই থেকে গিয়েছিল। একটি সরল গ্রাম্য লোককে যে অর্থে আমরা শিশু বলি। পিটার প্যানের মতো তা আর বাড়েনি। আর একটা দিকে তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ শিল্পী। একদিকে পরিপূর্ণ

শিশু, আর দিকে পূর্ণাঙ্গ শিল্পী। কোনো দিকেই বৃদ্ধির প্রশ্ন নেই, আরম্ভ ও ক্রম-বিকাশের পথে পরিণতির প্রশ্ন নেই, দুদিকেই আরম্ভ ও শেষ যেন একই সঙ্গে ঘটেছে।

সাধারণত কোনো শিশু যদি বয়স্কের ভূমিকা অভিনয় করে তাহলে শিশু এবং বয়স্ক কাউকেই তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিভূতিবাবুর সত্তায় দুইই ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে, কিংবা পাশাপাশি, এবং দুইয়ের কাউকেই কোনো অভিনয় করতে হয়নি, কেননা বিভূতিবাবু নিজে আশৈশব ছিলেন দর্শকের আসনে। তাঁর সৃষ্টিও তাঁর সেই দর্শনজাত। তার মধ্যে নিজেকে বার বার টেনে এনেছেন, কিন্তু কখনো তাকে নাটকীয় চরিত্রে পরিণত করেন নি। অতি সন্তর্পণে দুচোখ মেলে তিনি শুধু দেখেছেন, কাউকে আঘাত করেননি, প্রবলভাবে কোথায়ও নিজের দাবী নিয়ে দাঁড়াননি, কোথাও জবরদস্তি ক'রে কিছু আবিষ্কার করেননি, শান্তভাবে তিনি শুধু আবিষ্কার করেছিলেন নিজেকে। যেন তিনি তাঁর শিশু-রূপটিকেই প্রলম্বিত ক'রে শিল্পীর চোখে দেখতে চেয়েছিলেন বিশ্ব-সংসারের মধ্যে।

নিজের মধ্যে শিল্পী হিসাবে তিনি এমনই একটি চরিতার্থতা অনুভব করেছেন যে সেখানে হিংসা প্রতিহিংসার প্রয়োজন স্বভাবতই অনুভব করতে পারেননি। Inferiority complex থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকাতেই এটা সম্ভব হয়েছে। আত্মবিশ্বাস তাঁর এমনই প্রবল ছিল যে যদি কেউ মুখের উপর বলত 'আপনি লিখতে জানেন না', তা হ'লে সে কথায় আঘাত পাওয়া দূরের কথা, এমন সরল হাসি হাসতেন যা একমাত্র যে-ব্যক্তি অন্তরে একটি বড় সত্য উপলব্ধি করেছেন তিনিই হাসতে পারেন। তাঁর লেখা বিষয়ে কটু কথা শোনালেও তা তাঁর মর্মে লাগত না, সে কথা মনেও রাখতেন না। অহিংসা ধর্ম ছিল তাঁর রক্তে।

ব্যক্তিগত চরিত্র হিসাবে সরল পল্লীবাসী হওয়াতে যেমন তিনি পল্লীর প্রাণের সঙ্গে ছোট-খাটো সুখ-দুঃখের সহজ একাত্মকতা অনুভব করতেন, তেমনি বড় শিল্পী হওয়াতে সেই ছোটর মধ্যেই তিনি শিল্পের সম্পূর্ণ উপাদান খুঁজে পেতেন। দৃষ্টি এমনই অনুকম্পাপূর্ণ ছিল যে অত্যন্ত অল্পপরিসরে তিনি এত

বেশি জিনিষ দেখতে পেতেন যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায় না। তাঁর চোখে ছিল প্রিজম্‌-এর ত্রিশির কাঁচ, যেখানে শাদা চোখে শুধু শাদা দেখা যায় সেখানে তাঁর চোখ বিচিত্র বর্ণের খেলা দেখতে পেত। শিল্পী হিসাবে এইখানে তিনি ছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। আবার এইখানে সাধারণ পাঠকের পক্ষে ভুল বোঝারও অবসর ছিল। কারণ আমাদের চোখ ছোট জিনিসের সৌন্দর্য আবিষ্কারে অভ্যস্ত নয়। বৃহৎ ক্ষেত্রের পর্বত-সিন্ধু আমাদের মন ভোলায় বেশি, পায়ের কাছের শিশিরবিন্দুটি দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তাই বিভূতিবাবুর হাতের তুচ্ছ ফুলফল তৃণগুল্মের বিস্তার আর তুচ্ছ নর-নারীর সঙ্কীর্ণ জীবনের ব্যাপ্তি— এই দুইই প্রকৃত রসিক মহলের বাইরে হয় তো ঠিকমতো আদৃত হয় নি।

তার আরও কারণ এই যে একদিক দিয়ে শিল্পী হিসাবে তিনি যেন সম্পূর্ণতা নিয়েই জন্মেছিলেন, তাঁর পরিপুষ্টি ছিল আকস্মিক, তা শুধু তাঁর নিজেকে আবিষ্কারের অপেক্ষায় ছিল। তাই একদিকে যেমন তিনি ছিলেন আত্মসমাহিত, আত্ম-সম্পূর্ণতায় অপরিসীম তৃপ্ত, তেমনি নিজের দেখা জগতের বাইরের জগতে প্রবেশ তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। তিনি যে পরজগৎ নিয়ে আলোচনা করেছেন সে জগৎকেও যেন তিনি দেখেছেন, জেনেছেন এই রকম বিশ্বাস ছিল তাঁর মনে। তাঁর পরিচিত জগতের বাইরে শিল্পী হিসাবে আনাগোনা করা তাঁর পক্ষে বেদনাদায়ক ছিল। যে-ক্ষেত্রে অনুকম্পা ব্যাপ্ত হয় না, সে-ক্ষেত্র থেকে তিনি দূরে থাকতেন। যেখানে ঘৃণা জাগা সম্ভব সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি।

একদিন কথা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম "কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনি ভয়ানকভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন কখনো?"

তাঁর নির্বিরোধ নিস্পৃহ সহনশীলতা দেখেই কৌতূহল জেগেছিল। তিনি এ প্রশ্নে একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, হয় তো কষ্টবোধ করছিলেন। পরে সংক্ষেপে বলেছিলেন, "বেদনা পাই অন্যায় দেখে।" এর বেশি কিছু বলেননি।

বুদ্ধি ছিল তাঁর স্বচ্ছ। তিনি জ্ঞানী ছিলেন, পড়াশুনা করতেন যত্নের সঙ্গে। তাঁর প্রবৃত্তিও ছিল শিশুসুলভ। লোভ, লালসা, ভোগের বাসনা—

সবই ঠিক যে পরিমাণে থাকলে ছোটদের বেশ মানায়, তাঁর ঠিক সেই পরিমাণেই ছিল। শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে তা কাউকে কোনো উপলক্ষেই আঘাত করেনি। তাঁর এই ব্যক্তিগত দিকটির সঙ্গে পরিচয় ঘটলে তাঁর শিল্প-বৈশিষ্ট্যও সহজেই বোঝা যাবে।

তাঁর সঙ্গে একবার (১৯৩৩) সম্বলপুর জেলার এক জনহীন অরণ্যে গিয়েছিলাম ভ্রমণসঙ্গীরূপে। সেই প্রথম আমি তাঁকে আবিষ্কার করি। শিশু-সুলভ বহু পরস্পর-বিরোধী কৌতুকপূর্ণ কথা ও ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তাঁর চরিত্রের যে মাধুর্য তখন আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল তা আমি পরে যত্ন করেই লিখেছিলাম "পথের পাঁচালি" নাম দিয়ে পাটনার মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার সম্পাদিত প্রভাতী মাসিকপত্রে (১৯৪৫ সালে ৬ কিস্তিতে প্রকাশিত।) বি-এন-আর পথে শূন্য ট্রেনের মধ্যে আমরা যাত্রী ছিলাম চারজন মাত্র। চারদিকের উন্মাদ করা দৃশ্যের প্রতিক্রিয়ায় বিভূতিবাবুর চিৎকার করা, গান গাওয়া, এবং অতি উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়া—সেই একবার মাত্রই দেখা গিয়েছিল। বলা বাহুল্য আমার লেখা "পথের পাঁচালি"র নায়ক ছিলেন বিভূতিবাবু। (১)

তাঁর জন্ম হয় ১৩০০, সালে ভাদ্র মাসে। ইংরেজী ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। (২) জন্মস্থান মাতুলালয়ে, মুরারিপুর নামক গ্রামে। জায়গাটি কাঁচড়াপাড়ার সন্নিকটে। পিতার নাম মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শাস্ত্রী। ইনি ছিলেন জনপ্রিয় কথক, প্রসিদ্ধ কথক উদ্ধব শিরোমণির শিষ্য। বিভূতিবাবু পিতার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। বিভূতিবাবুর সহোদর সংখ্যা এক এবং সহোদরা দুই।

পিতা কথক ছিলেন অতএব বিভূতিবাবুও উত্তরাধিকারসূত্রে বক্তৃতা দেবার শক্তি লাভ করেছিলেন। উপরন্তু লেখার ভিতরেও তাঁর কথা বলার প্রবৃত্তি বড় পথ খুঁজে পেয়েছিল। বিভূতিবাবুর বক্তৃতা আমি শুনেছি, তা অতিশয় চিত্তাকর্ষক ছিল।

(১) পরে 'পথে পথে' বইতে ছাপার সময় এই ভ্রমণের নাম দেওয়া হয় 'সম্বলপুরের পথে'।

(২) এই তারিখটি যামেশ শর্মাচার্যের কাছ থেকে পাওয়া।

হুগলির কাছে সাগঞ্জ কেওটা গ্রামে প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের কাছে তাঁর হাতে-খড়ি। প্রথমে প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের কাছে এবং পরে যশোহরের বারাকপুর গ্রামে হরি রায়ের কাছে তাঁর প্রাথমিক বিদ্যালাভ। এঁদের দু জনের বর্ণনাই পথের পাঁচালিতে সবিস্তারে লেখা আছে। দুজনেই বিভূতিবাবুর মনে যে ছাপ এঁকে দিয়েছিলেন তা তাঁর লেখায় একসঙ্গে মিলে রূপ পেয়েছে।

বারাকপুরের পাঠশালার শিক্ষা শেষ ক'রে বিভূতিবাবু বনগ্রাম হাইস্কুলে ভর্তি হন। বনগ্রাম বা বনগাঁ বারাকপুর থেকে পাঁচ মাইল দূর, তিনি পায়ে হেঁটে স্কুলে যাতায়াত করতেন। পাঠ্যপুস্তক ভিন্ন অন্যান্য চিত্তাকর্ষক কোনো বই এখনকার মতো তখন পাড়াগাঁয়ে মিলত না, সুতরাং তখনকার একমাত্র সহজলভ্য বই রামায়ণ মহাভারত প'ড়ে পাঠের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে হ'ত। তা ছাড়া ভারত উপন্যাস নামক গদ্য গল্পের বইখানিও তিনি এই বয়সেই প'ড়েছিলেন।

এই সময় বালক বিভূতিভূষণের চরিত্রে একটা মজার বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। তখন তাঁর বয়স ন'দশ বৎসর। এই সময় তিনি একা বেরিয়ে যেতেন বহু দূরের কোনো নির্জন স্থানে, কখনো বা নির্জন নদীর তীরে। হাতে নিতেন একখানা বাঁশের কঞ্চি। সেই কঞ্চি হাতে একা দাঁড়িয়ে তিনি শূন্যে চীৎকার ক'রে গল্প বলতে শুরু করতেন। যে-কোনো গল্প যে-কোন বিষয়ে। ছোট ছেলেদের কাছে বয়স্করা যেমন বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতে থাকেন, সে গল্পের সঙ্গতি বিষয়ে কথকের কোনো দায়িত্ব থাকে না, অবিরাম ধারায় ব'লে যাওয়াই যে গল্পের প্রধান সার্থকতা, সম্ভব অসম্ভব যা মনে আসে নির্ভাবনায় বলা যায়, বিভূতিবাবুও এই বয়সে তাঁর কাল্পনিক শ্রোতাকে উদ্দেশ ক'রে ঠিক তেমনিভাবে গল্প বলে যেতেন। কোনো কোনো গল্প আবার এক দিনে শেষ হ'ত না, মাসিকপত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত গল্পের মতো তিনচার কিস্তিতে শেষ হ'ত। অকারণ কথা বলার আকাঙ্ক্ষা এবং কথা বলা উপলক্ষে কাহিনী বানিয়ে যাওয়ার আনন্দ, বালক বিভূতিভূষণকে নেশার মতো পেয়ে বসেছিল। লোকজন ডেকে সে সব কাহিনী শোনাবার মতো নয়। বালকের রচিত সে সব কাহিনীর

সমঝদার যে মানব সমাজে দুর্লভ এটুকু বোধ তাঁর তখনই জন্মেছিল। প্রাণে অফুরন্ত কথা অথচ শোনাবার লোক নেই, এমন অবস্থায় আর কি করা যায়? অতএব চল নির্জন স্থানে, গিয়ে ঘাসের কাছে, গাছের কাছে, হাওয়ার কাছে গল্প বল।

এর মধ্যে বাঙালী লেখকের ভবিষ্যতেরও বেশ একটা ইঙ্গিত আছে ব'লে মনে হয়। এদেশে গল্প লিখলেও তা কজন পড়ে? ভাল গল্প পড়ার মতো লোক বাঙালীদের মধ্যে অন্তত দশলাখ আছে। কিন্তু এক হাজার গল্পের বই বিক্রি করতেই প্রকাশকেরা হিমসিম খেয়ে যান। তাই বাঙালী গল্প লেখকের শেষ পর্যন্ত অরণ্যেই রোদন করতে হয়। বিভূতিভূষণ বাল্যকাল থেকেই এই অরণ্যে রোদন অভ্যাস করেছিলেন।

এই সময়ে খাতাতেও তারাশঙ্কর তর্করত্নের "কাদম্বরী"র ভঙ্গিতে রচনা লিখতেন। সন্ধ্যা বর্ণনার একটি ছত্রের নমুনা শোনালেন। যথা: "ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। মুনিগণ যে রক্তচন্দন সংযুক্ত অর্ঘ্য দান করিয়াছেন তদ্দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া যেন সূর্যদেব রক্তিম বর্ণ ধারণ করিলেন।" ইত্যাদি।

১৯১৬ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস ক'রে বিভূতিবাবু ভর্তি হন এসে রিপন কলেজে। এখানে সাধারণ ছাত্রের মতোই দিন কেটেছে তাঁর। তবে ডিবেটিং-এ খুব উৎসাহ ছিল, এবং অন্যান্য দলীয় কাজেও যোগ দিতেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন তখন রিপন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল।

বিভূতিবাবু যখন তৃতীয় বার্ষিকের ছাত্র সেই সময় প্রথম সাহিত্য প্রবন্ধ রচনা করেন। নূতনের আহ্বান নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন বিতর্ক সভায়। এই সময় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটেও তাঁর খুব যাতায়াত ছিল। সব বিষয়ে অগ্রণী হওয়ার বাসনা তাঁর এই সময়ে প্রবল ছিল। এমন কি এই সময় তিনি কবিতা লেখাতেও পশ্চাৎপদ হননি। যিনি ভবিষ্যতে ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক হবেন তাঁর প্রথম ছাপা রচনা একটি কবিতা, বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। উক্ত কলেজের ম্যাগাজিনে সেটি ছাপা হয়।

কলেজ জীবনে একমাত্র বিবাহ ছাড়া অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁর

মনে পড়ে না। অবশ্য বিবাহের একবৎসর পরেই স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। এই বিবাহ হয়েছিল বারাসত বসিরহাটের কাছে পানিতর গ্রামে। স্ত্রীর নাম ছিল গৌরী।

১৯২০ সালে বি-এ পাস ক'রে বিভূতিবাবু বছর খানেক আইন এবং ইংরেজীতে এম-এ পড়েছিলেন। এই সময় স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁকে পড়াশোনা ছেড়ে উপার্জনের চেষ্টা করতে হয়। শিক্ষকতা অন্যান্য চাকরির তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজ ব'লে এই পথেই তিনি প্রথম আসেন এবং মাঝখানে অন্যান্য নানাবিধ চাকরির পথ ঘুরে শেষ পর্যন্ত শিক্ষকতাতেই তাঁকে আবার ফিরে আসতে হয়েছিল।

প্রথম চাকরি ১৯২১ সালে হুগলির জঙ্গীপাড়া হাইস্কুলে। শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস তখন এই স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। কিন্তু এই স্কুলে বিভূতিবাবু এক বছরের বেশি থাকেন নি। পর বৎসর ১৯২২ সালে হরিনাভি হাইস্কুলে শিক্ষক হয়ে যান এবং এখানেও মাত্র দেড় বৎসর চাকরি করেন।

কিন্তু এইখানেই একটি মজার ঘটনায় তিনি নিজেকে আবিষ্কার করার সুযোগ পেয়ে যান, শূন্য প্রান্তরের কথক, লেখক হওয়ার প্রেরণা লাভ করেন।

বিভূতিবাবু হরিনাভিতে তখন নতুন এসেছেন। জায়গাটির সঙ্গে তখনও ভাল ক'রে পরিচয় ঘটেনি। দু'একখানা বই জোগাড় করতে পারলে হয় তো প্রথম-নিঃসঙ্গতার অস্বস্তি দূর হ'তে পারে এই রকম ভাবছিলেন। এমন সময় দেখেন একটি ছেলে চলেছে পথে। তিনি তাকে ডেকে আলাপ জমানোর চেষ্টা করলেন। জানতে পারা গেল ছেলেটি স্থানীয় রিপন লাইব্রেরিতে যাচ্ছে। বিভূতিবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন লাইব্রেরি থেকে একখানা বই সে তাঁর জন্যে এনে দিতে পারে কি না। সে বলল "নিশ্চয় পারি।"

বিভূতিবাবু তার নাম জিজ্ঞাসা করলেন।

ছেলেটি বলল "আমার নাম পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য, কিন্তু আমাকে সবাই 'বালক কবি' বলে জানে।"

"তাই নাকি? তা বেশ, তুমি বুঝি খুব কবিতা লেখ?"

সে খুব গর্বিতভাবে স্বীকার করল লেখে। এইভাবে বিভূতিবাবুর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। পাঁচুগোপালের উচ্চাশা অবশ্যই বিভূতিবাবুর চেয়ে অনেক বেশি ছিল, তাই সে একদিন এসে বিভূতিবাবুর কাছে এক দুঃসাহসিক প্রস্তাব ক'রে বসল। বিভূতিবাবুর মুখে সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা শুনে এবং তাঁর হাবভাব দেখে পাঁচুগোপাল নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল বিভূতিবাবু একজন "পোটেনশিয়াল" ঔপন্যাসিক। (এই অন্তর্দৃষ্টির জন্য তাকে প্রশংসা করতে হয়।) সে বলল, সে একটাকা সিরীজের উপন্যাস প্রকাশ করতে চায়।

"কোথায় ছাপবে উপন্যাস ?" বিভূতিবাবু প্রশ্ন করেন।

"কেন, এখানে সোনারপুরে জুয়েল প্রেস আছে, সেইখানে ছাপা হবে।"

ছাপা বিষয়ে নিশ্চিন্ততা প্রকাশ ক'রে বিভূতিবাবু বললেন—"কিন্তু উপন্যাস লিখবে কে ?"

"কেন আমরা লিখব। অর্থাৎ আপনি আর আমি !"

বিভূতিবাবু এমন একটি উত্তর মোটেই প্রত্যাশা করেননি, কাজেই তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। কখনো যে উপন্যাস লিখবেন এমন কল্পনাও তাঁর ইতিপূর্বে হয়নি। কলেজ জীবনে প্রবন্ধ কবিতা লিখে যে চাপল্য প্রকাশ করেছিলেন সে দিন আর নেই। এখন কঠোর জীবন-সংগ্রাম, সম্মুখে সবই অজানিত। তা ভিন্ন অখ্যাত লোকের গল্প, কে তা পড়বে, আর কে তা ছাপাবে। পাঁচুগোপালের কথায় মনে একটু রোমাঞ্চ জেগেছিল, কিন্তু উৎসাহ জাগেনি। তাছাড়া তার কথাটা নিতান্তই বালকোচিত এবং অবিশ্বাস্য মনে ক'রে তার কোনো জবাবও স্পষ্ট ক'রে তিনি দেননি।

কিন্তু পাঁচুগোপালকে তিনি চিনতেন না। সে হয় তো একটাকা সিরীজের উপন্যাস বের করবে ব'লে অনেক দিন ধ'রে স্বপ্ন দেখে আসছে, শুধু দোসর খুঁজে পায়নি এতদিন, তাই বিভূতিবাবুকে পেয়ে তার উৎসাহের আগুন দপ ক'রে জ্বলে উঠল।

পরদিনই দেখা গেল হরিনাভির পথে পথে প্রাচীরে প্রাচীরে, এমন কি স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ডে পর্যন্ত বিজ্ঞাপন আঁটা রয়েছে : বাহির হইল—বাহির হইল— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চঞ্চলা" উপন্যাস—দাম একটাকা।

এই পাঁচুগোপাল. উপন্যাস লেখার একটা ভদ্রসঙ্গত সময় দিল না, উপন্যাস বিভূতিবাবু আদৌ লিখবেন কি না তার প্রতিশ্রুতি পেল না, লিখিত উপন্যাস যন্ত্রস্থ হ'ল না, কিন্তু তরুণের স্বপ্ন-সম্ভাবনার বিজ্ঞাপন ঝুলতে লাগল হরিনাভির নাভিতে নাভিতে।

বিভূতিবাবু পড়লেন মুশকিলে। স্কুলের শিক্ষকরা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন—"বিভূতিবাবু লেখেন না কি ?" লিখি না বলার মতো মনের জোর কোনো শিক্ষিত তরুণ বাঙালীর আছে কি না সন্দেহ, বিভূতিবাবুও তখন তরুণ বৈ কি, তাঁরও ছিল না, কেননা 'লিখতে জানি না' বলা কাপুরুষতার পরিচায়ক। তাই তিনি হাঁ, না, ও কিছু না, প্রভৃতি অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ করে কাটিয়ে দিলেন, শিক্ষকদের মনে সন্দেহ আরও দৃঢ় হল।

বিভূতিবাবু পাঁচুগোপালকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কি করেছ ? কিন্তু পাঁচুগোপাল যা করেছে তা পাঁচুগোপাল জানে, বিভূতিবাবু জানেন, এবং সমস্ত হরিনাভির লোক জানে, কাজেই সে প্রশ্নের নতুন কোনো উত্তরের দরকার ছিল না। সেও গর্বিতভাবে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, বলবার কিছু ছিল না।

অতঃপর বিভূতিবাবুর মনে প্রশ্ন জাগল—আচ্ছা, এতটাই যখন হয়ে গেল, তখন সত্যিই লিখি না কেন ? প্রশ্নটি তাঁকে বিচলিত ক'রে তুলল। এই জাতীয় পাঁচ রকম ঘটনার যোগাযোগেই গল্প লেখার উপযুক্ত সময়টি তাঁর জীবনে একদিন সত্যিই এসে গেল, তিনি সত্যই লিখলেন একটি গল্প— কিন্তু সে গল্প পাঁচুগোপালকে ধন্য করতে অবশ্যই নয়।

গল্পের নাম হল উপেক্ষিতা। গল্প নিয়ে তিনি সোজা প্রবাসী অফিসে গিয়ে হাজির হলেন।

নবীন লেখকের বিচারালয় মাসিকপত্র। কার কাছে কি ভাবে লেখা

পেশ করতে হয়, এবং ছাপা হবে কি না কি ভাবে জানা যায়, এ সব বিষয়ে কোনো ধারণাই তাঁর ছিল না। সম্পাদকীয় বিভাগে তখন ছিলেন প্যারীমোহন সেনগুপ্ত। তিনি বিভূতিভূষণকে বললেন—"রেখে যান।" বিভূতিবাবু গল্পটি দিয়ে চলে এলেন, এবং জেনে গেলেন ছাপার জন্য মনোনীত হ'লে তিনি চিঠি পাবেন।

চিঠি একদিন সত্যই পাওয়া গেল—নির্ভুল প্রবাসী অফিসের চিঠি—শ্রীসুধীর চৌধুরীর লেখা—গল্প ছাপা হবে। বিভূতিবাবু তাঁর প্রথম চেষ্টার এই অপ্রত্যাশিত সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। সে যে কি আনন্দ, কি পুলক, তা কারো কাছে প্রকাশ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। যার সঙ্গে দেখা তার কাছেই তিনি প্রবাসীর চিঠির কথা পাড়তে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পড়েও শোনাতে লাগলেন। এই ভাবে হরিনাভির প্রত্যেকটি লোক বিভূতিবাবুর অসাধারণ ক্ষমতার কথা জানতে পেরে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

গল্পটি প্রকাশিত হলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিভূতিবাবুকে একখানি প্রশংসাসূচক চিঠি লেখেন, এবং বিভূতিবাবু এই আশাতীত অভিনন্দন পেয়ে ধন্য হন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী প্রোফেসর রূপে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারভাঙা বিলডিং-এ যেদিন তাঁর প্রথম বক্তৃতা দেন, বিভূতিবাবু সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে প্রবাসীর চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হ'লে চারুবাবু বিভূতিবাবুকে বললেন—আরও গল্প চাই।

এইভাবে উৎসাহিত হয়ে বিভূতিবাবু গল্প লিখতে শুরু করেন এবং প্রবাসীতে পর পর অনেকগুলো গল্প লেখেন। মৌরীফুল, উমারাণী, মেঘমল্লার, অভিশপ্ত এবং পুঁইমাচা। এর মধ্যে মৌরীফুল এবং মেঘমল্লার প্রবাসীর ঘোষিত পুরস্কার লাভ করে।

হরিনাভি স্কুলে বিভূতিবাবু দেড় বছরের বেশি ছিলেন না। স্কুল ছেড়ে এইবার ভ্রাম্যমান জীবন আরম্ভ হয় কিছু দিনের জন্য। কেশোরাম পোদ্দারের কাউ প্রোটেকশন লীগের সেক্রেটারিরূপে তাঁকে নানাস্থানে

সফরে যেতে হত। পূর্ববঙ্গ আসাম ব্যাপকভাবে এবং বর্মার মংড অবধি ভ্রমণের সুযোগ পান। এই উপলক্ষে বিভূতিবাবুর নানা দেশ, বিভিন্ন জাতি ও নদী অরণ্য পাহাড়ের সঙ্গে নতুন পরিচয় ঘটে, ও তাঁর নতুন অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

এক বছর ধ'রে অবিরাম এই ভাবে ঘোরাঘুরির পর তিনি পাথুরিয়াঘাটার খেলাত ঘোষের পৌত্র সিদ্ধেশ্বর ঘোষের প্রাইভেট সেক্রেটারি নিযুক্ত হন এবং পর বৎসর তাঁদের ভাগলপুর জমিদারীতে বদলি হন। এখানেও আর এক নতুন দেশের অভিজ্ঞতা, কারণ এখানে থাকার সময় তিনি মুঙ্গের, রাজগির, নালন্দা প্রভৃতি জায়গায় ভ্রমণ করেন। এবং ভাগলপুরে ব'সেই তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাস পথের পাঁচালি লেখেন। বিভূতিবাবু আমাকে বললেন, "পথের পাঁচালি যখন প্রথম লিখি তাতে দুর্গা ছিল না, শুধু অপু ছিল। একদিন হঠাৎ ভাগলপুরের রঘুনন্দন হল-এ একটি মেয়েকে দেখি। চুলগুলো তার হাওয়ায় উড়ছে। সে আমার দৃষ্টি এবং মন দুইই আকর্ষণ করল—তার ছাপ মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গেল, মনে হ'ল উপন্যাসে এই মেয়েকে না আনলে চলবে না। পথের পাঁচালি আবার নতুন ক'রে লিখতে হ'ল, এবং 'রিকাস্ট' করায় একটি বছর লাগল।"

"কাকে পড়ে শোনালেন প্রথম?"—আমি প্রশ্ন করলাম।

"নীরদ চৌধুরী। সে আমার লেখার প্রথম গুণগ্রাহী। আর সবাই আমাকে নিরুৎসাহ করেছিল। ৪১ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে বই পড়া হয়। উৎসাহিত হয়ে বিচিত্রায় উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে নিয়ে যাই। তিনি ছাপাতে থাকেন। বিচিত্রায় ছাপার পর প্রবাসী অফিসে সুনীতিবাবু, কালিদাস নাগ, অশোক চট্টোপাধ্যায়, সজনী প্রভৃতিকে পড়ে শোনাতাম। সাত আট দিন ধ'রে পড়া হয়। সজনী প্রকাশ করে।"

পথের পাঁচালি প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৩১ সালে রঞ্জন প্রকাশালয় থেকে। তার পূর্বে বরেন্দ্র লাইব্রেরি থেকে 'মেঘমল্লার' গল্পের বই ছাপা হয় ১৯৩০ সালে। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বিভূতিবাবু প্রথম প্রকাশিত নতুন বইয়ের যে

তালিকা দিয়েছিলেন—তার মোট সংখ্যা বাইশ। ১৯৪০ সালে তিনি বনগাঁয়ে অবস্থান কালে স্থানীয় এক্সাইস অফিসার শ্রীষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী রমাকে বিবাহ করেন। বিবাহ তারিখ ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ সাল।

দ্রুত ব'লে যাওয়া কথা থেকে 'প্রেসি রাইটিং'-এর ভঙ্গিতে আমি যেটুকু লিখে রেখেছিলাম তারই উপর নির্ভর ক'রে জীবনী অংশটি লিখছি। একবার ইচ্ছা হয়েছিল জীবিত লেখকদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখব তাঁদের জীবিতকালেই। নানা কারণে তা আর ঘটে ওঠেনি, কিন্তু এর মধ্যে থেকে আমার পরম প্রীতি এবং শ্রদ্ধাভাজন বিভূতিভূষণের কাহিনীটি তাঁর স্মৃতি-কথা রূপে তাঁর মৃত্যুর পর লিখতে হবে এটি স্বভাবতই আমার কাছে মর্মান্তিক। বিভূতিবাবু ছিলেন নিজেই একটি চরিত্র। মধুর ব্যক্তিত্ব দিয়ে তিনি বহুজনকেই আপনার ক'রে নিয়েছিলেন, তাই বহুজনের প্রীতির সঙ্গে আমার এই প্রীতি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদন ক'রে তৃপ্তি লাভ করছি।

(যুগান্তর সাময়িকী, ১৯৫০)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৩-৪৪ সালের কথা। খেয়াল হয়েছিল সমসাময়িক কয়েকজন লেখকের জীবন-কথা লিখতে আরম্ভ করব।

প্রথম প্রস্তাব বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর কাছ থেকে যেটুকু শুনেছিলাম তা নোট করা ছিল। দ্বিতীয় প্রস্তাব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর মুখে যেটুকু শুনেছিলাম আজও তা সযত্নে রক্ষা করছি।

আমার অন্যান্য বহু সদিচ্ছার মতো লেখকদের জীবনী লেখার সদিচ্ছাও বেশি দূরে অগ্রসর হয়নি।

১৯৫০ সালে, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ থেকে শোনা উপকরণের সাহায্যে, যুগান্তর সাময়িকীতে (১২-১১-৫০) একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম তাঁর মৃত্যুর পর।

আজ ১৯৫৬ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ঐ একই ভাবে আবার সেই পুরানো খাতা খুলে বসেছি।

মানিকের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বঙ্গশ্রী অফিসে—১৯৩৩-৩৪ সালে। ধর্মতলা স্ট্রীটে অবস্থিত সেই অফিসটি আকারে যেমন ছিল প্রশস্ত, আতিথেয়তায় তেমনি ছিল উদার। সেটি ছিল যেন একটি সাহিত্য, শিল্পী ও গুণীজনের মিলনক্ষেত্র, সপ্তদশ শতাব্দীতে খ্যাত বিলিতি কফি-হাউস।

মানিক তখন নিতান্তই তরুণ, আমার তুলনায় তো বটেই। বয়সে প্রায় বারো বছরের ছোট। ব্যবহারে নম্র, কিন্তু ব্যক্তিত্বে কঠোর। চেহারায় ব্যবহারে কথায় একেবারে স্বতন্ত্র। আপন ক্ষমতা বিষয়ে সচেতন নয়, কিন্তু আত্মশক্তি তার সমস্ত সত্তায় প্রতিফলিত।

প্রথমেই তার সম্পর্কে যেটি অনুভব করেছিলাম সেটি হচ্ছে তাঁর ঐ স্বাতন্ত্র্য। সব বিষয়ে সজাগ, বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি, অথচ সব বিষয়ে কেমন যেন

একটা রহস্যপূর্ণ সুদূরতা। একটা অবর্ণনীয় ঔদাসীন্য, অথচ তা মধুর এবং মহা আকর্ষক—যা প্রীতিকর, প্রসন্নকর এবং যার প্রতি উদাসীন থাকা অসম্ভব।

যে তরুণ যুবক আপন ক্ষমতা বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নয়, শিল্পসর্জন যার সহজাত ধর্ম, এবং সে বিষয়ে যার দাম্ভিকতার বা আত্মপ্রেমের অস্বস্তিকর প্রকাশ নেই, তাকে সাধারণের দলে ফেলা যায় না। তাই মানিক আমাদের ভাষায় উন্মাদ আখ্যা পেলেও একমাত্র সেই বৈশিষ্ট্যেই সে ছিল আমাদের প্রীতিভাজন।

একদিন শুনলাম সে রেস খেলে। এ সম্পর্কে তার সঙ্গে একদিন আলোচনা করতে গিয়ে দেখি এখানেও তার স্বাতন্ত্র্য।

আমি নিজে রেস খেলা সিনেমায় ভিন্ন অন্য কোথাও দেখিনি. ও সম্পর্কে আমার ধারণাও স্পষ্ট ছিল না, তবে এইটুকু জানা ছিল যে ও একটি প্রচণ্ড নেশা, ওতে জেতা নিতান্তই দৈবের ব্যাপার এবং যতই জেতা যাক শেষ পর্যন্ত পরাজয় হবেই।

মানিককে সেইভাবে বলতে গিয়েছিলাম, উপদেশ দিতে নয়, আরও জানতে। কিন্তু মানিক আমার কথা দু-এক মিনিট শুনেই খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে লাগল, "রেস খেলা আমার কাছে আর চান্সের খেলা থাকবে না।"

হাতে একখানা খাতা ছিল, সেখানা দেখিয়ে বলল, "অনেকদিন ধ'রে চেষ্টা করছি এর মধ্যে থেকে একটা নিয়ম আবিষ্কার করতে। জানেন, দিনের পর দিন আমি অঙ্ক কষে চলেছি আগের সব খেলার ফলাফল মিলিয়ে? এর মধ্যে একটা 'ল' আছেই, এবং সেটি আমি আবিষ্কার করবই। কার্য কারণ সম্পর্ক সব কিছুর মধ্যেই আছে, হিসেবে যতই এগোচ্ছি, ততই আমার মনে হচ্ছে পথ পাব নিশ্চয়।"

জোরের সঙ্গে বলল, "এ খেলা আর চান্সের খেলা থাকবে না। চান্সের খেলা সবার কাছেই মনে হয়, কিন্তু অনেক বছরের খেলা তুলনামূলক বিচার

ক'রে কেউ কি এর মধ্যেকার 'ল' আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছে? কেউ করেনি, তাই আমি করছি। চান্স অ্যাণ্ড প্রোব্যাবীলিটিরও একটা নির্দিষ্ট অনুপাত আছে, কার কতবার সফল বা বিফল হওয়ার সম্ভাবনা তাও তো ব'লে দেওয়া যায়। দেখবেন। আমিও পেয়ে যাব পথ।"

শুনছিলাম ওর কথা অবাক হয়ে। ওর যুক্তিতে কোনো ভুল আছে মনে হয়নি, কিন্তু এটি বুঝতে পেরেছিলাম ও যদি খেলার হার জিতের আইন একটা আবিষ্কার করেও, তবু ওর ব্যক্তিগত হার-জিত তার উপর কখনও নির্ভর করবে না।

কিন্তু রেস খেলার বিজ্ঞান আবিষ্কারের ধৈর্য কি ওর ছিল?

১৯৩৫ সালের কথা।—আজ থেকে ২১ বছর আগে।

২৫।২ মোহনবাগান রো-তে সজনীকান্ত থাকতেন দোতলায়, আমি একতলায়। তারিখটা ঠিক মনে নেই, কিন্তু এটুকু মনে আছে সজনীকান্ত কয়েকদিন অপরিবার ছিলেন। সে অবস্থায় মাত্র কয়েকদিনের জন্য দোতলার একটা ঘরে আড্ডা জমত। মানিক আসত। রাত ১১টার নিচে ওঠা হত না। সজনীকান্ত, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক ও আমি (আরও কেউ হয়ত আসতেন, মনে নেই) বাজি ধ'রে তাস খেলেছিলাম কদিন। হঠাৎ-খেয়ালের ব্যাপার। স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা। বাজির পরিমাণও চার পাঁচ টাকার বেশি নয়। যতদূর মনে পড়ে এ পরিকল্পনাটা মানিকের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল।

এই সামান্য ঘটনা থেকে মানিকের পরিচয় আরও খানিকটা আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। ওর বাজি ধরার ধরন ছিল বেপরোয়া। তার মধ্যে সতর্কতার কোনো বালাই ছিল না, সবটাই চোখ বুজে ঝাঁপিয়ে পড়া। সমধর্মী সজনীকান্তকেও সে এ বিষয়ে চমকিয়ে দিয়েছিল, এবং এটি মনে আছে যে প্রতিদিনই মানিককে ঘরে ফেরার বাস ভাড়া দিয়ে দিতে হ'ত যাবার সময়।

অন্ধকারে চোখ বুজে ঝাঁপিয়ে পড়াই ওর স্বধর্ম। পিছনে কিছু বাঁধন রেখে চলা ওর স্বভাব ছিল না।

১৯৪৪ সালে ওর 'জননী' উপন্যাসখানির পুনর্মুদ্রণের জন্য জেনারেল প্রিণ্টার্সের শ্রীসুরেশচন্দ্র দাসের সঙ্গে মানিকের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিই। সেই সময় একদিন বসেছিলাম ওর জীবনীকথা শুনতে ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীটে।

মানিক বলতে লাগল—

"আমার জন্ম দুমকায়, বাবা তখন সেখানে গভর্মেণ্ট অফিসার।

"১৯২৬ সালে আমি ম্যাট্রিক পাস করি, তখন আমার বয়স সাড়ে পনেরো বছর।

"প্রথম শিক্ষা কোথাও বাঁধাবাঁধি নিয়মে হয় নি, কখনও মহিষাদলে, কখনও টাঙ্গাইলে, কখনও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। সমস্ত স্কুল জীবনটাই কেমন যেন ছন্নছাড়া। ক্লাসের পড়া খুব ভাল লাগত না। খেলায় ঝোঁক ছিল বেশ। মন মাঝে মাঝে দুর্দান্ত হয়ে উঠত, কখনও বা একা ব'সে ব'সে চিন্তা করতাম।

"১৯২৮ সালে বাঁকুড়া কলেজ থেকে আমি আই. এসসি পাস করি। সেখানে জ্যাকসন নামে এক অধ্যাপক আমার উপর খুব প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি আমাকে বাইবেল পড়ান। সেণ্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স কোরে ভর্তি হই এবং কাজ শিখি—এবং ডিপ্লোমা পাই। বাইবেল আমি খুব যত্ন করে পড়েছিলাম। এই সময়ে আমার মন থেকে ধর্ম বিষয়ে সকল রকম গোঁড়ামি দূর হয়ে যায়।

"প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এসসি পড়ি। এইখানে সাহিত্য বিষয়ে বিতর্কে যোগ দিয়েছি খুব। আমি বলেছিলাম একটুখানি বুদ্ধি থাকলে যে কোনো লোক পাঠযোগ্য গল্প লিখতে পারে।

"অনেকে আমাকে চ্যালেঞ্জ ক'রে বসলেন, আমিও সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। বললাম তিন দিন সময় চাই। আমার বন্ধুরা এই তিন দিন আমাকে খুব খাওয়ালেন। আমি তিন দিনে গল্প লেখা শেষ ক'রে নিয়ে গেলাম বিচিত্রায়, নিজে। মাসের মাঝামাঝি সময় সেটা। পরবর্তী সংখ্যাতেই সে গল্প ছাপা হ'ল। গল্পের নাম 'অতসী মামী'। ছাপার পর সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং এলেন আমার কাছে পনেরোটি টাকা আর একখণ্ড বিচিত্রা নিয়ে। বললেন—আরও গল্প চাই।

"আমার মত এই ছিল যে, ৩০ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত আমি লেখা আরম্ভ করব না, কারণ তার আগে মনের বয়স বাড়ে না। কিন্তু উপেনবাবু ছাড়লেন না, অতএব আমার মত টিকল না।

"অতসী মামী লিখেছিলাম ছদ্মনামে। ভেবেছিলাম ৩০ বছরে পৌঁছলে ছদ্মনাম ছেড়ে স্বনামে লিখব। কিন্তু কোনো ইচ্ছাই রইল না, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই রয়ে গেলাম, যদিও আমার আসল নাম প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"১৯৩০ সালের কোনো সময় আমার জ্যেষ্ঠের সঙ্গে লেখা নিয়ে আমার কিছু মনান্তর ঘটে, তিনি এ সময় আমার লেখায় মেতে থাকার বিরোধী ছিলেন এবং এ নিয়ে আমাকে একখানা চিঠি লেখেন। আমি এজন্য সবার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে মেসে চলে আসি। এর পর বছর দুই আমাকে ভাগ্যের সঙ্গে খুব লড়াই করতে হয়।

"শেষ পরীক্ষা আমার দেওয়া হল না, কিন্তু কারো চাকরিও কখনো করব না এই ছিল ইচ্ছা। কিন্তু সে ইচ্ছাও রাখতে পারিনি।

"১৯৩৮ সালে কলকাতায় অবসরপ্রাপ্ত হেডমাষ্টার সুরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী কমলার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়।"

এর পর মানিকের সঙ্গে তার প্রকাশিত বই সম্পর্কে কথা হয়, কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।

নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে পারিপার্শ্বিক জীবনকে দেখা, তাকে রূপায়িত করার সহজ দক্ষতা এবং তার সঙ্গে রেস খেলার প্রতি আকর্ষণ, রেস খেলাকে বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা, বাজি ধ'রে তাস খেলায় বেপরোয়া পণ—যোগ ক'রে মানিকের একটা পরিচয় পেয়েছিলাম। তারপর যখন তার জীবনকথা শুনতে বসলাম, তখন দেখি জীবনের আরম্ভ থেকেই এর প্রস্তুতি চলেছে। তার যে মানসিক প্রবণতা তার নিজের কাছেও অজ্ঞাত ছিল, তার অবাধ বৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ সে পেয়েছিল বাল্যকাল থেকেই।

স্কুল জীবন থেকেই তার কোথাও কোনো স্থায়ী বন্ধন নেই। কলেজে এসে প্রথমেই বাইবেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তার মন থেকে সর্ব সংস্কার দূর

করে দিয়েছে। তারপর বি. এসসি পড়তে পড়তে বাজি ধ'রে গল্প লেখার মধ্যে তার প্রথম পরিচয় ফুটে উঠল ; এরপর মানিকের পক্ষে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

মানিক শুধু নিজের জীবনকে নয়, তার স্বদেশের ও স্বকালের মানুষের জীবনকে চ্যালেঞ্জ করতে লাগল ধীরে ধীরে। ক্রমে জীবনের রূঢ় সত্যের সঙ্গে তার বেধে উঠতে লাগল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত কাটিয়ে উঠে নির্জলা বাস্তবের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল সে। এইখানে মানিকের জয় এবং পরাজয় ঘটল যুগপৎ।

ভাগ্যের প্রচণ্ড পরিহাস। নেমেসিস নামক গ্রীক দেবী, কর্তৃত্ব তাঁর বিশ্বব্যাপী। শুনি তিনি অতিভাগ্যবানদের অতি-শাস্তির ব্যবস্থা করেন। পরিহাসবশতই হয় তো। জীবনকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখার ভাগ্যই কি মানিকের অতিভাগ্য? হয় তো তাই, তাই নেমেসিসের আঘাত তার উপর, তাই তার প্রচণ্ড পরাজয়। বাস্তব জীবন থেকে দূরে সরে গিয়ে শিল্পীর ধর্মকে পরিত্যাগ করা তার পক্ষে অসম্ভব—এই পণ নিয়ে সে এলো উন্মুক্ত জীবন প্রাঙ্গণে। তার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, কিন্তু সে ক্ষমতাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখেনি। লড়াই করতে হ'লে যে কৌশলের প্রয়োজন হয়, তা আর তার আয়ত্ত করা হ'ল না, সে ধৈর্যও তার ছিল না, তাই সে মাঝপথে গিয়ে পরাজিত হল, বাস্তবতার পূজারী বাস্তবতার বিভীষিকা থেকে পলায়নের পথ খুঁজতে লাগল।

তারপর যেমন সে রেস খেলতে গিয়ে শূন্য পকেটে ফিরত, যেমন সে বাজি ধ'রে তাস খেলতে গিয়ে শূন্য পকেটে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেত, আজও সে তেমনি জীবনের সঙ্গে বাজি ধ'রে হেরে ফিরে গেল।

ফিরে গেল, কিন্তু অনুশোচনা নিয়ে নয়। কোনো দিন সে বাজি ধ'রে অনুশোচনা করেনি।

সে কখনও প্রফেট সাজেনি, বাণী দেয়নি, সে 'এক্সিবিট' করেনি, শুধু 'রিভীল' করেছে—শিল্পীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম পালন করেছে। তার ভাষার মাধুর্যের হয় তো কিছু অভাব ছিল, কিন্তু তা ছিল অমোঘ শক্তিবিশিষ্ট। তার মধ্যে

অনুতাপের স্থান ছিল না। মানিক শেলীর ভাষায় কখনও চীৎকার ক'রে বলতে পারল না—I fall upon the thorns of life ! I bleed !

সে কার কাছে কাঁদবে ? সে নিজেই ছিল অবাধ্য ওয়েস্ট উইণ্ড।

তার জয়ও এইখানে। তাকে শূন্য পকেটে ফিরে যাওয়ার হাত থেকে কারো বাঁচাবার উপায় ছিল না। তার জীবন নিয়ে যে ব্যঙ্গ নাট্য রচিত হয়েছিল, তার অনিবার্য পরিণতি এটাই। তার মধ্য দৃশ্যের উপর যবনিকা টেনে দেওয়া নাটকের দাবীতেই প্রয়োজন ছিল, আর সে কাজ সে নিজ হাতেই ক'রে গেছে। (যুগান্তর সাময়িকী, ১৯৫৬)

ভূতের ভবিষ্যৎ

ভূত আপনারা দেখে থাকবেন, আমি কখনো দেখিনি। আমি অবশ্য সেই ভূতের কথাই বলছি, লক্ষ লক্ষ বছর ধ'রে যে ভূত মানুষের পাশাপাশি বাস ক'রে আসছে।

দেখিনি, কিন্তু তাকে আমি চিনি। না দেখলেও, তার পরিচয় সবার মুখস্থ। রবীন্দ্রনাথ ভূত দেখেননি, কিন্তু ভূত চিনতেন। তাঁর এক গল্পের নায়ক ভূতের পাল্লায় পড়েছিল। তিনি ভূতের সঙ্গে কেষ্টার চেহারার তুলনা ক'রেছেন।

ভূত দেখা নিয়ে দু'টি দল আছে। একদল ভূত অতি সহজে দেখে, আর একদল আদৌ দেখে না। একদল লোক বরাবর ভূতের পক্ষে, আর একদল লোক কোনোদিনই ভূত মানে না। একদল লোকের কাছে ভূত কৌতুক, আর একদলের কাছে ভূত বিভীষিকা। ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় ও পরশুরামের যাবতীয় ভূত কৌতুক ভূত। কিংবা তারা এককালে বিভীষিকা ছিল, এঁদের হাতে প'ড়ে কৌতুকীভূত হয়েছে।

ভূত যারা দেখে না, তারা প্রায় সবাই অবিশ্বাসী। ভূতে যাদের বিশ্বাস নেই, সাধারণের বিচারে তারা নাস্তিক। অর্থাৎ ভগবানকে মানতে হ'লে ভূতকেও মানতে হবে। আরো সহজ ভাষায়: যারা ভূত মানে, ধ'রে নেওয়া যায় তারা ভগবানকেও মানে। তার কারণ একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে মানা চলে না। ভগবান ও ভূতের মধ্যেকার সাঁকোটি সামান্য দীর্ঘ। ওটিকে জোড়াসাঁকো বলাই ঠিক। ভূতের সীমা ও ভগবানের সীমা জুড়ে আছে ডবল লাইন। মাত্র দশ জন লোক চক্রান্ত করলেই ভগবান ভূত হয়ে যান। অর্থাৎ ভূতের দলে মিশে পড়েন। প্রাচীন প্রবাদ: দশচক্রে ভগবান ভূত।

ভূতের সাধারণ পরিচয় হচ্ছে: দেহমুক্ত এমন একটি প্রেত, যা ইচ্ছে করলেই প্রেতদেহরূপে দেখা দিতে পারে, যদিও সাধারণ লোকের কাছে তা

প্রীতিপ্রদ নয়। মাত্র বিশেষ এক জাতীয় সাধকের কাছে প্রেতমাত্রেই অভিপ্রেত।

মানুষ মারা গেলে তার আত্মা শূন্যে ঘুরে বেড়ায়—এ বিশ্বাস অনেক দিনের। ভূত-দেখা লোকের দেখাও পৃথিবীর সব দেশে মিলবে। তাদের সংখ্যা কম নয়।

কিন্তু আমি বুঝতে পারি না মানুষের দেহ ভূত হয় কি ক'রে। কারণ যে মানুষ মারা গেছে ভূত তার পরিচিত দেহেই দেখা দেয়। এই দেহ সে পায় কোথায়? হয়তো আত্মা ভূত হলেও ভৌতিক বস্তুরও ভূত হওয়ার সম্ভাবনা একটা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাইকেলে-চলা মানুষ-ভূতের সাইকেলও ভূত এবং যে জামাকাপড় প'রে মানুষ-ভূত দেখা দেয়, সে জামা-কাপড়ও ভূত। মানুষের দেহের মতো সাইকেল, জামা, কাপড় প্রভৃতি ভৌতিক বস্তুরও ভূত হওয়ার কোনো সহজ উপায় অবশ্যই আছে, আমি ঠিক জানি না। হয়তো অপঘাত মৃত্যুতে সব বস্তুই ভূত হয়, অথবা, বিকল্পে, সব বস্তুরই আত্মা আছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে সব বিলিতি কাপড় পোড়ানো হয়েছিল, সে সব কাপড় অবশ্যই ভূত হয়েছে। (তবে তারা স্বাধীনতার পরেও এ-দেশে আছে কিনা জানি না।) যে সব সাইকেল বা রেলগাড়ি দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়েছে, তারাও অবশ্যই ভূত হয়েছে। বিমান, জাহাজ, নৌকো সবারই ভূত আছে। তবে সুবিধে এই যে, এ-সব জড় ভূত মানবীয় আত্মিক ভূতের চালনা ভিন্ন চলতে পারে না। মানবীয় ভূতের পোষাক পরার দরকার হ'লে পোষাকের ভূত গায়ে জড়িয়ে নেয়, সাইকেলে চড়তে হ'লে সাইকেলের ভূতে চ'ড়ে বেড়ায়। আত্মিক ভূত ও জড় ভূতের এই আত্মীয়তা, আত্মা ও জড় দেহের আত্মীয়তার সঙ্গে তুলনীয়। বেশি ভাবতে গেলে ভয়ে জড়সড় হ'তে হয়। মনে করুন, একখানা সাইকেল-ভূত বিনা আরোহীতে আপনার সামনে দিয়ে ক্রিং ক্রিং করতে করতে ছুটে চলে গেল, কিংবা একখানা কোঁচানো শাড়ির ভূত আপনার নাকের কাছে এসে ঝুলছে—তাহলে আপনার সমস্ত আত্মিক শক্তি প্রয়োগ করেও আপনার ভৌতিক দেহটাকে কম্পনের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না।—কিন্তু

সৌভাগ্যের বিষয়, জড় ভূত সাধারণত তা করে না। শুধু ম্যাকবেথ একবার শূন্যে ছোরার ভূত দেখেছিল, জানা যায়।

কিন্তু জড় ভূত কেন দেখা যায় না, মাঝে মাঝে এর সদুত্তর পেতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, ভূতকেই এ-কথা জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু কোথায় ভূত? আজ পর্যন্ত কারো দেখা পেলাম না। অথচ এই বাংলাদেশেই যে কত ভূত আছে, তার হিসেব নিলে সেন্সাস কর্তাদের মাথা ঘুরে যাবে। যারা ভূত দেখেছে, তাদের নাম ছাপা হওয়ার যদি কোনো সুযোগ ক'রে দেওয়া যায়, তাহলে লক্ষ লক্ষ লোকের স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে এই বাংলাদেশেই। এই কনফেশনের জন্য পুলিসের চাপ দরকার হবে না, অপরাধীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নাম লিখিয়ে যাবে। আমার মতে অপরাধী ভিন্ন অন্য কাউকে ভূতেরা দর্শন দেয় না। (আত্মপ্রচারে উৎসুক ভূতেরা এইভাবেই কার্যসিদ্ধি ক'রে থাকে।) অন্য কথায় ভূত দেখাই একটি অপরাধ।

আগেই বলেছি বাংলাদেশে ভূতের সংখ্যা খুবই বেশি। অতএব পুলিস বিভাগের কর্তব্য ভূতদের জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা। বিনা লাইসেন্সে ওরা কাউকে দেখা দিতে পারবে না, এমন কড়া আইন হ'লে দেশের আয় বৃদ্ধির একটা পথ খুলে যাবে। সকলেই জানেন, একমাত্র মৎস্যভুক ভূত ভিন্ন অন্য কোনা ভূতই ভিক্ষে ক'রে খায় না, অর্থাৎ তাদের যথেষ্ট আয় আছে এবং সে আয়ের উপর সম্ভবত ট্যাক্স ধরা যায়।

ভূত-বিশেষজ্ঞ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ভূতদের একটি বৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। ভূতের প্রধান বৃত্তিই সেইটি, অর্থাৎ ভূত হওয়ার সেটি প্রধান শর্ত। তাঁর এক ভূত বলছে—"তোমরা কিছুই জান না, লোকে বলে অমুক মানুষ মরিয়া ভূত হইয়াছে। ঠিক সেটি সত্য নয়। মানুষ নিজে মরিয়া নিজের ভূত হয় না। মানুষ মরিলে আমরা কেহ গিয়া তাহার ভূতগিরি করি। লক্ষ লক্ষ ভূত পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছে। কেহ বা ভূতগিরি করিবার কর্ম পাইয়াছে, কেহ বা ভূতগিরি করিবার উমেদারি করিতেছে, আবার কেহ বেকার বসিয়া আছে। আমাদের যিনি কর্তা, তিনিই ভূতদিগকে এই কার্যে নিযুক্ত

করেন। ভূতকে তিনি বলেন,—'যাও, অমুক মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাক, সে মরিলে তাহার ভূত হইও, তাহার ভূতগিরি তোমাকে দিলাম।''

এ-কথা সত্য হ'লে এটি একটি বিরাট শ্রমিক প্রতিষ্ঠান। এবং ভালো প্রতিষ্ঠান, কেননা, ভূতদের কখনো ধর্মঘট কিংবা হরতাল করতে শোনা যায় না। ভূতদের উৎপত্তি সম্পর্কেও ত্রৈলোক্যনাথ একটি নতুন কথা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

''যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, অন্ধকার জমিয়া তেমনি ভূত হয়। জল জমাইয়া বরফ করিবার যেমন কল আছে, অন্ধকার জমাইয়া ভূত করিবার কল কি সাহেবরা করিতে পারেন না? অন্ধকারের অভাব নাই। নিশাকালে বাহিরে তো অল্পস্বল্প অন্ধকার থাকেই। তারপর মানুষের মনের ভিতর কত যে অন্ধকার আছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই।...এই অন্ধকার কলে ফেলিলেই প্রচুর পরিমাণে ভূত প্রস্তুত হইতে পারিবে। তাহা হইলে ভূত খুব শস্তা হয়। এক পয়সা, দুই পয়সা বড় জোর চারি পয়সা করিয়া ভূতের সের হয়। শস্তা হইলে গরীবদুঃখী সকলেই যার যেমন ক্ষমতা ভূত কিনিতে পারে।''

ত্রৈলোক্যনাথ তলিয়ে দেখেন নি, কিন্তু সে কল সাহেবরা তৈরি করেছিলেন অনেক আগেই। এবং কলে ভূত তৈরি ক'রে বোতলে পুরে তা তাঁরা পানও ক'রে আসছেন অনেক দিন ধ'রে। সাহেবদের ভাষায় প্রেতাত্মা ও সুরা দুটিকেই স্পিরিট বলা হয়। আমাদের দেশে যদিও চোলাইয়ের যন্ত্র প্রাচীন কাল থেকে আছে, কিন্তু তবু তা থেকে স্পিরিট তৈরি হয়নি কখনো, সুরা তৈরি হয়েছে। স্পিরিটের মতো সুরা প্রেতার্থক নয়, যদিও প্রেতগ্রস্ত মানুষ অনেকটা নেশাগ্রস্তের মতোই ব্যবহার ক'রে থাকে।

আর অন্ধকার জমানোর কল আমাদের দেশের অন্তরে-বাহিরে ছড়াছড়ি যাচ্ছে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ভূত শস্তা হোক আশা করেছিলেন হয়তো এই ভেবে যে তা হ'লে অন্তত আমাদের মনের অন্ধকার মন থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। তাঁর সে আশা পূরণ হয়নি কিন্তু ভূত কোনো অজ্ঞাত

কারণে এ-দেশে এখন অত্যন্ত শস্তা হয়ে পড়েছে। শস্তা মানে, ওদের জনসংখ্যা, মানুষের জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। ওরা মানুষের শ্রমে ভাগ বসাচ্ছে পাইকারি হিসেবে। মানুষ বেকার হচ্ছে কিন্তু ভূতের আর এখন বেকারত্ব নেই। হয়তো বা ভূত আর কল এখন সমার্থক। মানুষ ভূতের বেগার খাটছে, ভূতের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। (তুলনীয়: "কেন ভূতের বোঝা বহিস মিছে"—ডি এল রায়।) যন্ত্রই এখন দানব হয়ে পড়েছে, ভূতের মতো মানুষের ঘাড় মটকাচ্ছে, একথা পৃথিবীর মনীষীমাত্রেই স্বীকার করেছেন।

ভূতেরা সাধারণত পড়ো ভাঙা বাড়িতে কেন থাকতে ভালবাসে তা বোঝা যায় না। অনেক ভূত ডাকবাংলোতে থাকা পছন্দ করে শুনেছি। কোনো কোনো ভূত পথে, কোনো কোনো ভূত শ্মশানে, কেউ বা গাছে থাকে। শ্মশানে ভূতের কি ইণ্টারেস্ট, তা নিয়ে গবেষণা হওয়া দরকার। কোনো শ্মশানেই এখন বেতাল দেখা যায় না, ভূতমাত্রেই এখন বেতালা।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে যে ভূত গাছে থাকে, তারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়। ("লব্ধপ্রতিষ্ঠ" সাহিত্যিকেরা সাবধান!) তিনি বলেছেন, শ্মশানে এবং গোরস্থানেই অধিকাংশ ভূতের বাস, তবে শুভাদৃষ্টের বলে আমাদের দেশের অনেক ভূত বৃক্ষশাখায় আধিপত্য দ্বারা সম্মানিত। যাদের অদৃষ্টে গাছের ডাল জোটেনি তারা এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকে। প্রমথ চৌধুরীর সাহেব ভূত কিন্তু ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাস ভিন্ন ভ্রমণ করত না।

ভূত সম্পর্কে এই জাতীয় সব পরস্পরবিরোধী উক্তিতে ভূত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয় না। যারা ভূত দেখেছে তারাও বলে, তাদের চেহারা স্পষ্ট নয়। মনে হয়, যত মত তত ভূত।

ভূতদের সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করা অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। যে বাড়িতে ভূত থাকে, সে বাড়ি খালি প'ড়ে থাকে, কেউ ভাড়া নিতে সাহস করে না। ভূত নানারকম অত্যাচার করে ভাড়াটেদের উপর, এ রকম অভিযোগ আছে তাদের বিরুদ্ধে। আজ পর্যন্ত কোনো ভূত এর প্রতিবাদ

করেনি। মনে হয় কথাটা সত্য। সে ভাড়াটেকে লক্ষ্য ক'রে ঢিল ছোড়ে, কিন্তু ভূতের পক্ষে ঢিল ছোড়া কি সম্ভব? হয়তো পৃথিবীতে যে সব ঢিলের অপমৃত্যু ঘটেছে তারা ভূত হয়ে ভূত সমাজে বাস করে, ভূতেরা সেই সব ঢিলের ভূত ছুড়ে মারে।

যত মত তত ভূত, এই কথাই সত্য। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ইঙ্গিত স্পষ্ট। অন্ধকার জ'মে ভূত হয় কথাটি দামী। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন "শরৎ আলোর কমল বনে, বাহির হয়ে বিহার করে, যে ছিল মোর মনে মনে।" শরতের যে শোভা বাইরে রূপ ধরেছে তা তাঁর মনেরই প্রতিফলন, সে সৌন্দর্য তাঁর মনেই ছিল। ভূত ঠিক এর উল্টো। সেও মনের প্রতিফলন, কিন্তু সৌন্দর্যের নয়, অন্ধকারের। যে যে-রকম ভূত পছন্দ করে, সে সেই রকম ভূতই দেখে।

ভূত মনেরই সৃষ্টি; কখনো বা ভয়ের; যেমন ম্যাকবেথ বলছে—

Is this a dagger which I see
before me
The handle toward my hand?
......or art thou but
A dagger of the mind, a false creation
Proceeding from the heat-oppressed brain? (II-II)

কিংবা লেডি ম্যাকবেথ—

This is the very painting cf your fear;
This is the air-drawn dagger—(III-IV)

কিন্তু তবু শুধু ভয়ের নয়, ভূত মানুষের প্রয়োজনের সৃষ্টি। অতএব ভূত মিথ্যা নয়। আমার বিশ্বাস ভূত সৃষ্টি না করলে মানুষের জীবন সম্পূর্ণ স্বাদহীন হত। ভূত আত্মরক্ষার তাগিদেই সৃষ্টি। জীবন সার্থক করার জন্য মানুষ দুটি আশ্চর্য জিনিস সৃষ্টি করেছে, (অথবা আবিষ্কার করেছে)। এক, ভগবান; আর এক, ভূত। এলোমেলো অনন্ত বিশ্ববস্তু-সম্ভারে দিশেহারা হয়ে সে ভগবানকে সৃষ্টি করেছে, নইলে সে উন্মাদ হয়ে যেত। এই ভগবান তাকে

বিরাট এবং দুর্বোধ্য শূন্যতার ভয়াবহতা থেকে বাঁচিয়েছে। সে বিশ্বাস করেছে সব এলেমেলো নয়; বিশ্ব, বিশ্ববিধানে বাঁধা। এই বাঁধনে সে নিজেকে বেঁধে তবে শান্তি পেয়েছে। সে জানত না মাঝে মাঝে বাঁধন ছিঁড়ে অনিয়মের স্রোতে ডুব দিতে না পারলে বাঁধন শুধুই বাঁধন। তাই সে ঐ একই সঙ্গে ভূত নামক একটি সকল বাঁধন ছিন্নকারী জীবকে গ'ড়ে নিয়েছে। যেখানে-সেখানে এই ভূত আচম্বিতে দেখা দেয়, জীবনের একটানা গতি হঠাৎ ডিগবাজি খেয়ে উল্টে যায়, শ্রদ্ধেয় ভারী-বুদ্ধি মানুষও হঠাৎ শিশু হয়ে পড়ে, মুক্তকচ্ছ হয়ে প্রাণভয়ে ছুটতে থাকে, চিৎকার করে, ওঝা ডাকে। ভগবানের মতো সাব্‌লাইমের পাশে ভূতের মতো হাস্যকর জীব না থাকলে জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হ'ত। ভূতনাথের সঙ্গে তাই ভূতকে থাকতেই হয়। ভগবান ও ভূতের এই সম্পর্ক আর কোনো দেশ কল্পনা করতে পারেনি।

বিভ্রান্ত বুদ্ধি বা ইণ্টেলেক্টকে শান্ত করার জন্য ভগবানের প্রয়োজন ছিল, এবং ইণ্টেলেক্টকে ভেঙেচুরে তছনছ ক'রে দেওয়ার জন্যই ভূতের প্রয়োজন ছিল।

ইংরেজরা ভূতের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে নেশার সাহায্যে এবং ঠিক এই কারণেই মদ ও প্রেতদেহ দুইই তাদের ভাষায় স্পিরিট। উন্মত্ততার জন্য, বুদ্ধিকে সাময়িকভাবে শিকেয় তুলে রাখার জন্য, তাদের দরকার এই স্পিরিট। কিন্তু তবু স্পিরিট কোনোদিনই জনসাধারণের পক্ষে সুলভ নয় বলে এবং ভূত অত্যন্ত শস্তা ব'লে, ভূতের উপরেই সাধারণ লোকের ভরসা বেশি। এ ভূতের ভবিষ্যৎ মন্দ এমন কথা অবশ্যই বলা চলে না।

(শারদীয় যুগান্তর, ১৯৫৬)

পশু, পশুপতি ও আমরা

আমরা যখন-তখন মানুষকে গাল দিতে হ'লেই বলি লোকটি ইতর। অর্থাৎ তিরস্কারপ্রাপ্ত লোকটি নিচের ধাপের লোক। নিচের ধাপের প্রাণীদেরও বলি মানবেতর প্রাণী।

সাম্প্রদায়িক ইতরতাও আছে। অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলে ব্রাহ্মণেতর। বৈদ্যেতর কায়স্থেতর বা ক্ষত্রিয়েতর শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না। হয় তো আছে। হয়তো তারাই সেই শ্রেণীর ইতর, বিয়েতে যারা মিষ্টান্ন খেতে চায়। মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।

ইতর অর্থে অপর, এখন তা আর কেউ জানে না, বা জানলেও মানে না।

ইতর কথাটি এখন ঘৃণাব্যঞ্জক, নইলে আর গাল দেবার সময় ব্যবহার করি কেন। ইতর প্রাণী বলতেও কিছু পরিমাণ ঘৃণামিশ্রিত ভাব। ইতর অর্থাৎ নীচ। মানুষকেই মানুষ ইতর বলে, পশুদের তো বলবেই। পশুপাখী কীট-পতঙ্গ সবাই মনুষ্যেতর প্রাণী।

অথচ উপদেশের বেলায় শুনি কুকুরের কাছ থেকে প্রভুভক্তি শিখবে, পিঁপড়ের কাছ থেকে সঞ্চয় শিখবে, মৌমাছির কাছ থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা শিখবে, এবং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। এর অর্থ কি?

ওষুধের বিজ্ঞাপনে অনেক সময় ইতর প্রাণীদের ছবি দেওয়া হয় স্বাস্থ্যের আদর্শ দেখানোর জন্য। কুমীরের দাঁত, সিংহের পেশী ইত্যাদি। পঞ্জিকায় সালসার বিজ্ঞাপনে সিংহের সঙ্গে মানুষের লড়াইয়ের ছবি থাকে। সালসা-শক্তির চিত্ররূপ সেটি, সিংহের মতো বিক্রম, আদর্শ বিক্রম। সবই ঠিক, সিংহও জানে তার শক্তি সত্য, কিন্তু এটাও জানে যে সে শক্তি সালসা খেলে লাভ হয় না।

এ ভিন্ন অনেক জাতির প্রতীকও পশু। ব্রিটিশ লায়ন, রাশিয়ান বেয়ার। এইভাবে ইতর প্রাণীদের আমরা বিভিন্ন দিক থেকে শ্রদ্ধা করি। প্রাচীন

নীতিমূলক কাহিনী প্রায় সবই পশুপাখীদের নিয়ে লেখা। অথচ এরা সবাই ইতর, অর্থাৎ ঘৃণ্য। সবাই মনুষ্যেতর। যদি তাই হয় তবে সর্বদা নীতিশিক্ষার জন্য পশুদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় কেন?

করা হয় কারণ মানুষ তার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এখনও নিঃসন্দেহ নয়। নিঃসন্দেহ নয় এই জন্য যে সে সত্যিই অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে সব দিক দিয়ে উচ্চস্তরের নয়। একমাত্র দুষ্টবুদ্ধিতে সে শ্রেষ্ঠ, সদ্‌বুদ্ধিতে নয়। এ দিক দিয়ে সে এখনও নিচের ধাপে প'ড়ে আছে। পশুপাখীদের চেয়ে অনেক নিচের ধাপে। তার কারণ সদ্‌বুদ্ধির যৎসামান্য যে পুঁজি তার আছে ব'লে তার বিশ্বাস, তা স্থিরবস্তু কিছু নয়। তা সব সময় চেষ্টার দ্বারা উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে হয়—ভিজে কাঠকয়লায় ফু দিয়ে যেমন আগুন ধরাতে হয়, তেমনি। এই ফুঁ-এর অভাব ঘটলেই তা আর জ্বলে না, নিবে যায়, এবং তখন সে যাবতীয় ইতর প্রাণী থেকে ইতর হয়ে পড়ে। প্রতিনিয়ত শক্তি ব্যয় ক'রে সদ্‌বুদ্ধির আলো জ্বালিয়ে রাখতে পারে কজন মানুষ? সব উদ্যম যে উপার্জনের এবং বাজার খরচের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানেই ব্যয় হয়ে যায়—উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না।

মানুষের বিবেচনায় পশুপাখী ইতর। ওদের ভাষা বুঝতে পারলে জানা যেত ওদের বিবেচনায় মানুষও ইতর। মানুষ পশুপাখীর উপর যত অকারণ অত্যাচার করে, পশুপাখীরা মানুষের উপর ততখানি আকারণ অত্যাচারের কথা ভাবতেই পারে না।

যে-কোনো কুকুর এই মুহূর্তে প্রতিবাদ ক'রে জানাতে পারে প্রভুভক্তি নামক কোনো বৃত্তি তাদের মধ্যে নেই, যা আছে তা সাধারণ বন্ধুত্ববৃত্তি। প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক স্থাপন ক'রে মানুষ যেমন মানুষকে, তেমনি পশুকে, নিচে নামিয়ে দিয়েছে জোর ক'রে। ও সম্পর্ক এ যুগে অচল। কুকুর ভৃত্যের কাজ করে না, যথার্থ বন্ধুর কাজ করে, এবং তার মধ্যে ফাঁকি নেই। কুকুর কখনো তার "প্রভু"কে হত্যা ক'রে সব লুট ক'রে পালিয়ে যায় না। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের আজ ঐটিই যুক্তিসঙ্গত পরিণাম।

পশুপাখীদের সমস্ত জীবনধারা একটা নিয়মের অধীন। তারা সে নিয়ম কখনো ভাঙে না। পশুপাখীদের সংবিধানে মাঝে মাঝে অ্যামেণ্ডমেণ্টের দরকার হয় না। একমাত্র মানুষই প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করে।

মানুষ কথায় কথায় বলে অমুকের পাশবিক ব্যবহার বা পাশবিক বৃত্তি। এ রকম বলা অন্যায়। কেননা মানবীয় বৃত্তি আরও ঘৃণ্য। মানুষকে পশু বললে পশুকে বেশি অপমান করা হয়। কারণ পশুবৃত্তি ইউনিফর্ম, অতএব অনিন্দ্য। মানুষ সব সময় নিজের স্বার্থ এবং শক্তি বুঝে নিয়ম বদলায়। কতকাল ধ'রে মানুষ মৃত্যুদণ্ড থাকা উচিত কিনা ভেবে পাচ্ছে না, আবার সেই মানুষই ঐ একই সঙ্গে এক একটা জাতিকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য অস্ত্র তৈরি করছে।

মানবিক ব্যবহার পরস্পরবিরোধী, তাই মানবিক করুণা ও পারমাণবিক অস্ত্র দুইই সে একসঙ্গে অনুশীলন করে। সে একই নিশ্বাসে দুই বিপরীত কথা বলে। কুকুরকে প্রভুভক্ত ব'লে গদগদ হয় এবং অনুরক্ত মানুষকে কুকুর ব'লে গাল দেয়। জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটলেই যে খুশি, এবং তারই প্রতিদানে যে পরম বন্ধুর কাজ করে, এবং যে চরিত্র প্রয়োজনে প্রশংসিত, সেই চরিত্রই গাল দেবার ভাষা। এবং শুধু এ দেশেই নয়, ইংরেজদের দেশেও 'ডগ'-এর একটি অর্থ পাজি লোক, অথচ তারা কুকুরকে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সম্মান করে এবং ভালবাসে। এরই নাম পরস্পরবিরোধী ব্যবহার। এই পরস্পরবিরোধিতার আর একটি প্রমাণ—আমরা গান গাইবার সময় গাই—"মানুষ আমরা নহি তো মেষ" এবং হাতে খড়্গ নিয়ে মেষ হত্যা করি। মনুষ্যত্বটা আমাদের তা হ'লে কোথায় ?

আমরা আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে পশুদের বিচার করি, পশুরাও নিশ্চয় তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে বিচার করে। অতএব সুখে থাকতে হ'লে কেউ কারো অধিকারে না যাওয়াই ভাল। এ বিষয়ে পশুপাখীদের সঙ্গে মানুষের একটি চুক্তি হ'লে ভাল হয়। কিন্তু মানুষই সে চুক্তি করবে না,

কেননা বাঁচতে হ'লে তাকে পশু বধ করতেই হবে। কিন্তু পশুরা মানুষ খেতে এলেই মানুষের সব বিচারবুদ্ধি অন্তর্হিত।

বাঘ যে হিংস্র প্রাণী একথা শিশুপাঠ্য বইতেও লেখা থাকে। কিন্তু মানুষ কি রকম প্রাণী তা মানুষের অজ্ঞাত ব'লেই সে নিজের কোনো পরিচয় লিখতে পারে না। মানুষ এক একটা দেশের আদিবাসীদের হত্যা ক'রে সে সব দেশে উপনিবেশ গ'ড়ে তুলেছে। অথচ মানুষ হিংস্র প্রাণী, সোজাসুজি এ কথাটি স্বীকার করতে আটকায়। মানুষের সংজ্ঞায় বলা হয় সে পশুবৃত্তি ও বিচার-বুদ্ধির যোগে তৈরি। Animality plus rationality। কিন্তু এ কোন্ বিচার বুদ্ধি, র‍্যাশন্যালিটি? নিজের স্বার্থটি পুরো বজায় রেখে বিচার। ওটি বিচার বুদ্ধি নয়, চতুর বুদ্ধি। তবে একথা সত্যি যে মানুষের মধ্যে যে পশুত্ব আছে তা অতিক্রম ক'রে দেবত্বে পৌঁছাবার সম্ভাবনা বা ক্ষমতা তার মধ্যে আছে। এবং সেই ক্ষমতা আছে ব'লেই সে অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র।

হয় তো একথা সত্যি। কিন্তু তাতে লাভ কি? অতিরিক্ত কি সুবিধে তাতে পাওয়া যাবে? এই দেবত্ব মানে কি? পৌরাণিক দেবতাদের চরিত্র আলোচনা করলে দেখা যাবে তাঁরা মানুষের চেয়ে অনেক বেশি ধূর্ত ছিলেন। এমন কি আজকের ভারতীয় সংবিধান মতেও তাঁদের প্রায় সবাই দণ্ডযোগ্য। তাঁরা এমনই চতুর ছিলেন যে তাঁদের তোয়াজ না করলে কেউ একটা পাই পয়সা আদায় করতে পারত না। এবং তাঁদের ধামা ধরতে পারলে যে-কোনো অভাজনও অনেক সুবিধে আদায় করতে পারত।

কোনো দেবতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাউকে কিছু দান করেননি। 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল'—এই হচ্ছে দৈব নীতি। এর কখনো ব্যতিক্রম হয়নি। ধামা ধরতেই হবে, পায়ে পড়তেই হবে। মণের পর মণ ঘি না পোড়ালে বর পাওয়া যাবে না। এই দেবত্ব কি ইতিমধ্যেই আমাদের হস্তগত হয়নি? আমরা না হয় ঘিএর বদলে তেল ব্যবহার করি। অতএব বিস্তর সাধনা ক'রে এই দেবত্ব লাভ করার কোনো মানে হয় না। যা আছে তার জন্য অতিরিক্ত প্রয়াস পণ্ডশ্রম মাত্র।

যদি বলা যায়, ও-দেবতা নয়, দেবত্ব বলতে আমদের মনে যে একটি অস্পষ্ট এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট ধারণা আছে, সর্বগুণের সমন্বয়ে তৈরি যে দেবত্ব, তাই আমাদের মধ্যে জাগাতে হবে, তা হলেও দ্বিতীয়বার কথাটা ভেবে দেখা দরকার।

ভেবে দেখলে বোঝা যাবে ওতেও আমাদের সুখ হবে না। আদর্শ দেবতা হ'লে আমরা প্রত্যেকে এক একটি পাষণ্ড হব। কারণ তখন আমাদের খাওয়াপরা চলাফেরা কথাবার্তা সবই একটা নির্দিষ্ট মাপে চলবে; সবই আদর্শ, সবই গ্রীক মর্মরমূর্তির মতো নিখুঁত সুন্দর, কোথায়ও কোনো ত্রুটি থাকবে না। এমন কি প্রেম করতে হবে ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্র শাসিত ভাষায়। উচ্ছ্বাস নেই, উদ্বেগ নেই, আবেগ নেই, সব ওজন করা।—মানুষ তিন দিনের বেশি এ অবস্থা সহ্য করতে পারবে না।

অতএব যা আছে তাই ভাল। মানুষ হয়ে মানুষকে বিট্রে ক'রে লাভ কি। এই মানবজীবনটা যে ভণ্ডামির একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র, সেই জন্যই মানবজীবনের সার্থকতা। মানুষ যে পশু অথচ তা সে স্বীকার করতে চায় না, অথবা (তন্ত্রমতে) পশু মানে যে মদ্যমাংসত্যাগী শুদ্ধাচারী সংযত সাধক—এইটে ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, এই পরস্পরবিরোধিতার জন্যই মানুষ, মানুষ।

দেবতাদের মধ্যে একমাত্র শিব সর্বদা পশুদের মধ্যে প্রায় পশুজীবন যাপন ক'রে পশুপতি নাম গ্রহণ করেছেন ব'লে তিনি এত হিউম্যান, তাঁকে আমরা তাই এত ভালবাসি। শিব আমাদের স্বগোত্র। পশুত্বের দিকে এমনি আমাদের টান। আমাদের এই স্ববিরোধিতার মূলে রয়েছে আমাদের চরিত্র। আমাদের এই চরিত্রের এক পা পশুত্বের দিকে, আর এক পা দেবত্বের দিকে। তাই আমরা ও দুটোর কোনোটাই পুরোপুরি হতে পারিনি, হয়েছি মানুষ নামক এক সংজ্ঞাহীন খিচুড়ি।

দুই নৌকায় পা দিয়ে একা মানুষ কখনো জেতেনি, কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা জিতেছি। আমরা বিশুদ্ধ দেবত্বের মরুভূমিতে পড়িনি, বিশুদ্ধ পশুত্বের বাঁধা পথেও ঘুরি না, তাই আমরা স্ববিরোধী মানুষ, তাই আমরা দেবতা ও পশু উভয়েরই সমান ঈর্ষার পাত্র। (মঞ্জরী, পূজাসংখ্যা ১৯৫৬)

স্বপ্ন

বর্ষার এক ঘনবর্ষণের রাত্রে রেডিওয় গান শুনছিলাম—

"গহন রাতে শ্রাবণধারা পড়িছে ঝরে
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে।"

গান শোনা শেষ হ'লে উপলব্ধি করলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়ে আমি একমত।—ওকে জাগানো ঠিক নয়।

জাগানো ঠিক নয় এই কারণে যে ও ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে।

"এখনো দুটি আঁখির কোণে যায় যে দেখা
জলের রেখা
না-বলা বাণী রয়েছে যেন অধর ভরে।"

কবি ওকে না জাগাবার এই একটি মাত্র কারণ উল্লেখ করছেন। আমার মনে কিন্তু আরও কয়েকটি কারণ জাগছে, যদিও তার সবগুলো প্রকাশ্যে বলা যায় না।

না ঘুমোলে ওর স্বাস্থ্য খারাপ হবে, একথা অবশ্য বলা চলে। এমন কি ঘুমোনো যে ওর স্বাস্থ্যের জন্যই দরকার, স্বাস্থ্যশাস্ত্র থেকেও সে কথা প্রমাণ করিয়ে দেওয়া যায়।

আবার ওকে যার জাগানো দরকার, সে বলবে বেশি ঘুমোলে ও মোটা হয়ে যেতে পারে, অতএব বেশি ঘুমোনো অ্যালাউ করা যায় না।

এই দুই বিপরীত মতকেই আমি মানছি। আমি শুধু বলছি ওর স্বাস্থ্য চুলোয় থাক, ও যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, এটাই বড় কথা। অতএব ওকে আরও একটু ঘুমোতে দাও।

ও ঘুমোচ্ছে এবং স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু আরও বড় কথা হচ্ছে স্বপ্ন দেখার জন্যই ও ঘুমোচ্ছে। জীবনে ও যা পায় নি, স্বপ্নে ও তা পাবে। অতএব ওকে জাগিও না।

ঘুম স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজন এ কথা আমরা সবাই শুনি বা বলি। ঘুমের হেতু সম্পর্কেও অনেক কথা শুনেছি। মোটকথা ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা সবাই ক'রে থাকি। কেউ বলে কফি খেলে ঘুম হয় না, কেউ বলে হয়। আবার কেউ বলে কফি না খেলে ঘুম হয় না। চা সম্পর্কেও ঐ একই কথা। মতভেদ সংসারে আছে, কেননা সংসারে স্বাস্থ্যভেদ আছে।

কিন্তু এ প্রসঙ্গ থাক। মোটের উপর সবাই আমরা ঘুমের দাস, যদিও এই দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। শুধু তাই নয়, অনেক সময় মনে হয় জেগে থাকাটাই মানব জীবনের এক মহা অভিশাপ। সমস্ত জীবন ঘুমিয়ে কাটালে কি ক্ষতি ছিল ?

জেগে থেকে আমরা জগতের কি মহা উপকারটাই বা করি ? সমস্ত দিনরাতের হিসেব নিলেই বোঝা যাবে চব্বিশ ঘণ্টা শুধু নিজেকে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা। প্রত্যেকটি মানুষের এই একই ইতিহাস।

পাঠক বলবেন, তবু সমস্ত জীবন ঘুমোলে কি ভাল লাগত ? আমি বলি তার মতো ভাল আর কিছুতে লাগতো না। সংসারে মানুষের জেগে থাকার কি সার্থকতা ? কি অর্থ ?

কেন, মানুষ যে এত সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে, এত ইতিহাস রচনা করেছে, জেগে না থাকলে তা কি ক'রে সম্ভব হ'ত ?

আমি বলি জেগে থাকতে হয় বলেই তাকে এত কাণ্ড করতে হয়েছে, নইলে সে উন্মাদ হয়ে যেত। কিন্তু সৌন্দর্য সৃষ্টি, আবিষ্কার, উদ্ভাবন, কোনোটাই তার জেগে থাকবার যথেষ্ট খোরাক নয়। যুদ্ধ, হানাহানি, ধ্বংসও তার চাই। অথচ ঘুমিয়ে থাকলে এসব কিছুরই দরকার হত না। জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য মানুষের যেমন মৃত্যু চাই, জাগরণ থেকে পালিয়ে যাবার জন্য তেমনি তার ঘুম চাই।

পাঠক বলবেন, তুমি দুঃখবাদী তাই তুমি সব জিনিসের খারাপ দিকটাই আগে দেখ। অর্থাৎ তোমার মতে মানুষের না জন্মানোই উচিত ছিল ?

আমি বলি, দুঃখবাদ সম্পর্কে এই ধারণা অস্পষ্ট। দুঃখবাদীই জীবন চায়, মরণ চায় না; জাগরণ চায়, ঘুম চায় না। তার কাছে মৃত্যু বিভীষিকা, ঘুম ভয়াবহ। আমি এর উল্টোটা বিশ্বাস করি। আমার মতে মৃত্যুর মধ্যে যেমন আরাম, এমন আর কিছুতে নেই। ঘুমের মধ্যেও তাই। কথা এই যে, মানুষ পৃথিবীতে এসে এ যাবৎ যা করেছে, তাতে আদৌ সে না জন্মালে পৃথিবীর খুব যে ক্ষতি হ'ত তা মনে হয় না। এমন মানুষহীন পৃথিবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি আছে। মানুষ নেই, কিন্তু তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ঠিক। গ্রহ উপগ্রহ তাদের সূর্যদের ঘিরে ঠিক নিয়মে পাক খেয়ে চলেছে। কোটি কোটি বিশ্বের মধ্যে পরমাণুর চেয়ে তুচ্ছ মানুষ, ঘুমিয়ে থাকে কি জেগে থাকে, তা নিয়ে বিশ্ব-বিধানের কোনো মাথাব্যথা নেই অবশ্যই। ওটা আমাদের মাথাব্যথা।

মানুষ নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করতে গিয়ে পরস্পরের জন্য ভাল কাজও কিছু করেছে, একথা ঠিক। কিন্তু সমস্ত ভাল এবং মন্দ কাজের উর্ধ্বে এ সংসারে তার কি প্রয়োজন? অতএব শুধু জীবন ভাল কি শুধু মৃত্যু ভাল, কিংবা আদৌ না জন্মানো ভাল, তার মীমাংসা করা সহজ নয়।

পাঠক বলবেন, ঘুমের কথা হচ্ছিল, তাই বল, বিশ্বরহস্য বা জীবনমৃত্যুর কথা শুনতে চাই না।

আমি বলি, এক পাক বিশ্ব পরিক্রমা ক'রে দেখা গেল ঘুমের সমর্থন পাওয়া যায় কি না। আমার ধারণা, পেয়েছি। মানুষ ঘুমোতেই চায়। দেহ তার ফিট থাকে ঘুমোলে, সে কথা গৌণ। আসল কথা হচ্ছে, ঘুমোলে সে স্বপ্ন দেখে। অর্থাৎ স্বপ্ন দেখার জন্যই অধিকাংশ লোক ঘুমোয়। মানুষ বাস্তব জগতে সুখী হতে পারেনি, তাই সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সাহিত্য সঙ্গীত প্রভৃতি স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি ক'রেছে। জাগ্রত অবস্থায় চেষ্টা ক'রে সে যে জগৎ মনের মতো ক'রে গড়তে পারেনি, ঘুমোলে আপনা থেকেই সে-জগৎ তার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়। জেগে থেকে মানুষ মনের মতো জগৎ গড়ার স্বপ্ন দেখে, ঘুমোলে গোটা বাস্তব জগৎই তার কাছে স্বপ্নের রূপ ধরে। অন্য কথায়, স্বপ্নজগৎই তখন বাস্তব ব'লে বোধ

হয়। স্বপ্নহীন ঘুম তাই জাগরণে ব্যর্থ মনে হয়। অন্তত আমার কাছে তাই। আমি জাগ্রত অবস্থায় আকাশে উড়িনি, স্বপ্নে উড়েছি। জাগ্রত অবস্থায় একটি সমুদ্র পার হইনি, স্বপ্নে আমি বিখ্যাত ভূপর্যটক। মোটকথা আমার জীবনের যা কিছু ফুলফিলমেণ্ট সবই স্বপ্নে। তাই আমি ঘুম ভালবাসি। তাই মৃত্যু চাই, কারণ মৃত্যু হয়তো সবটাই স্বপ্ন—যে স্বপ্ন হ্যামলেট ভয় করেছিল ঃ

"...To die, to sleep ;
To sleep : perchance to dream ;
ay, there's the rub ;..."

ব্রাদার, তোমার কপালে যে দুঃখ আসবে তা তোমার ঐ স্বগতোক্তি থেকেই বোঝা যায়। তুমি চাও স্বপ্নহীন নিদ্রা। পাছে মৃত্যু-নিদ্রাতেও স্বপ্ন দেখ, তাই তোমার মৃত্যু-ভয়। তুমি এমন মৃত্যু চাও যা সম্পূর্ণ শূন্য, চাও total annihilation! তোমার সঙ্গে ঐখানেই আমার ভেদ। আমি চাই স্বপ্ন দেখতে, আমি চাই মৃত্যু আর নিদ্রা হোক সমার্থক।

এই স্বপ্নগর্ভ ঘুম চোখ খুলেও ঘুমোনো যায়। পৃথিবীর সকল শিল্পী সাহিত্যিক বিজ্ঞানী চোখ খুলে ঘুমোন আর স্বপ্ন দেখেন, তাই এত বড় বড় সৃষ্টি আর আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। হাজার হাজার বছর ধ'রে পৃথিবীতে যত স্রষ্টা মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁরা নিদ্রায় জাগরণে শুধু স্বপ্ন দেখেছেন। সেই স্বপ্নই তো তাঁদের সৃষ্টি। তাঁদের মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু তাঁদের স্বপ্ন দেখা এখনও শেষ হয়নি। এই স্বপ্নই তো কবির ভাষায়—

"· দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদুর যুগান্তরে।"

হাজার হাজার বছরের অন্ধকার থেকে এই স্বপ্নের স্রোত বয়ে চলেছে বর্তমানের বুকের উপর দিয়ে, এবং তাকে অতিক্রম ক'রে দূর ভবিষ্যতের পথে। এই স্বপ্নপ্রবাহে ডুব দিয়ে আমরা বাঁচি, এ থেকে মাথা তুললেই বাজার খরচের হিসেব। সে অতি সাংঘাতিক জাগরণ। জেগে চার টাকা সের মাছ কিনি,

মনে হয় আর বেঁচে লাভ কি ? কিন্তু তখনই স্বপ্ন দেখি মাছের সের একদিন চার আনা হবে।

প্রকৃতিস্থ হয়ে টাকা বের করি।

পাঠক বলবেন, ঘুম সম্পর্কে এই কি তোমার শেষ কথা ?

আমি বলি তা হতেই পারে না। স্বপ্নহীন ঘুমই আমার ভাল লাগে, তা না হলে ছটফট করি, কখনো ঘুমের ওষুধ খাই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যাঁরা অন্তত বারো ঘণ্টা স্বপ্নহীন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন না থাকতে পারেন, আমার মতে তাঁরা হতভাগ্য।

এটি অবশ্য আমার জাগ্রত অবস্থার সুচিন্তিত মত।

(শনিবারের চিঠি, পূজা সংখ্যা, ১৯৫৬)

সিনেমার আদি অন্ত

ইউরোপের জাতিসমূহ যখন প্রাণচাঞ্চল্যে পৃথিবীর সর্বত্র অভিযান চালাচ্ছে, যখন তারা সমুদ্রের নিচে নামছে, পর্বত চূড়ায় আরোহন করছে, আফ্রিকার ভয়াবহ অরণ্যে প্রবেশ করছে, মেরু প্রদেশে যাত্রা করছে, এবং পৃথিবীটাকে প্রায় উল্টে পাল্টে দেখে পৃথিবী ছেড়ে অন্য গ্রহে যাবার সম্ভাবনা কল্পনা করছে, তখন আমরা ঘরে ব'সে ব'সে শাস্ত্র মিলিয়ে দেখছি সমুদ্র যাত্রায় কতখানি পাপ হয় এবং তার প্রায়শ্চিত্ত কি। তারপর যখন তারা প্রবল ভাবে এসে পড়ল আমাদেরই মধ্যে এবং এসে লুটেপুটে খেতে লাগল আমাদেরই অন্ন, তখন আমরা সেটিকে পূর্বজন্মের কর্মফল ব'লে আত্মতৃপ্তিজনিত আরামে হাত গুটিয়ে ব'সে রইলাম ঘরের মধ্যে।

আমরা প্রায় ধ'রেই নিলাম, ওদের ধর্ম হচ্ছে চলা, আমাদের ধর্ম হচ্ছে ঘরে ব'সে থাকা। ওদের ধর্ম হচ্ছে নতুন ঐতিহ্য রচনা করা, আমাদের ধর্ম হচ্ছে প্রাচীনকে আঁকড়ে থাকা। ওদের ধর্ম হচ্ছে লৌহ-মুদ্গর, আমাদের ধর্ম হচ্ছে মোহ-মুদ্গর। ওদের ধর্ম হচ্ছে "কা তব কান্তা" অতএব ঘরের মায়া কাটাও, আমাদের ধর্ম হচ্ছে "কা তব কান্তা" অতএব জীবনের মায়া কাটাও।

কিন্তু ওদেরই সংস্পর্শে বহুদিন বাস ক'রে, ওদের নড়াচড়ার ছোঁয়া লেগে আমাদেরও মনে কিছু চাঞ্চল্য জাগল বৈ কি! কিন্তু জাগলে কি হবে, সুযোগ নেই। সুযোগ যে তারা হরণ করেছে কিছু, এবং বাকীটা আমরা তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। তাই ওরা জাহাজে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায়, এসে ভেড়ে আমাদেরই ঘাটে, কিন্তু আমাদের জাহাজে ওঠার পয়সা নেই। আর এই অভাবটা উগ্রভাবে আমরা অনুভব করেছিলাম স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। কারণ সেই যুগেই আমাদের প্রথম জাগরণ।

সেই থেকে মনে মনে ন'ড়েচ'ড়ে বেড়াবার অদম্য বাসনা এবং ইচ্ছাপূরণের অক্ষমতা নিয়ে আমরা প্রতিদিন ছটফট করে মরছি। কারণ স্বাধীনভাবে

নড়াচড়ার আমাদের উপায় ছিল না। সবই ছিল প্রভুদের হাতের বরাদ্দ। র‍্যাশন-দোকানের চালের মতো আমাদের চালচলন ছিল নিয়ন্ত্রিত। তাই তারা যখন নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হাজার হাজার সৈনিকের মৃত্যুমূল্য দেবার ঐতিহ্য গ'ড়ে তুলছে, তখন আমাদের স্বাধীনতা লাভের জন্য একটিমাত্র তরুণ যুবক আত্মদান করলেও আমরা গর্বে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছি। মনে আশা জেগেছে মৃত জাতি আবার জাগবে।

আর ঠিক এই কারণেই যে দিন সিনেমা পর্দায় আমরা প্রথম আমাদের দেশী লোককে নড়তে দেখলাম, সেদিন আমাদের আনন্দের সীমা রইল না। আমরা দলে দলে ছুটে গেলাম সেই নড়া দেখতে। সেখানে দেখলাম সত্যিই আমরা নড়ছি। আশ্চর্য ব্যাপার! বাস্তব জীবনে সাড়া জেগেছে—ফোটোগ্রাফও নড়তে শুরু করল! একেবারে ষোল আনা রেনেসাঁসের আভাস! আর ভয় নেই, নিদ্রিত জাতি সত্যই জাগল—আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু।

আনন্দটা তখন এমনই বেপরোয়া ছিল যে সিনেমায় নড়া যে আর্টেরই একটা অঙ্গ সে কথা চিন্তা করারও সময় পাইনি। তাই সেদিকে যে শূন্যের প্রথম আবির্ভাব ঘটল তারই সঙ্গে অবিরাম শুধু শূন্যই যোগ ক'রে যেতে লাগলাম। অর্থাৎ দিনের পর দিন ফোটোগ্রাফগুলো পর্দায় শুধু হাত পা ছুড়তে লাগল, কিন্তু তার মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, তারা কোনো কিছুর ইঙ্গিত দিল না। দেওয়ার দরকারও ছিল না, কারণ যারা দেবে তাদের কোনো শিক্ষা ছিল না, আমাদেরও কোনো দাবী ছিল না। কারণ শুধু নড়াটাই আমরা জাতীয় গৌরবের ব্যাপার ব'লে মেনে নিয়েছিলাম—স্বদেশী আন্দোলনের সময় যেমন আমরা মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিয়েছিলাম। তার ব্যাবহারিক দিকের সঙ্গে যে সুবিধার দিকও একটা থাকা উচিত সে কথা জোর ক'রেই তখন ভুলেছি। তবে কাপড়ের বেলায় সেটা অন্যায় হয়নি, অন্যায় হয়েছে সেই একই আদর্শে বিভিন্ন জাতীয় জিনিসকে গ্রহণ করায়। যেমন স্বদেশী ভাবপ্রবণতার মুখে স্বদেশী কাঠের ঘড়ি মায়ের দেওয়া মোটা জিনিস ব'লে মাথায় তুলে নেওয়ায় বিপদ আছে। বিলিতি বর্জন উপলক্ষে কেউ যদি এমন রেডিও সেট

তৈরি করে যা বাজে না, তা হ'লে বোধকরি সেটি স্বদেশী ব'লেই কেউ মাথায় তুলবেন না। যদি তোলেন তা হ'লে বোঝা যাবে উদ্দেশ্য উনুন ধরানো।

অথচ স্বদেশী সিনেমার বেলায় আমরা ঐ ভুলই করেছি। কারণ সে সময় বিদেশী ছবি নির্বাক অভিনয় বিদ্যায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এমনি অবস্থায় এ কথা বলা চলে না যে এটা আমাদের আরম্ভ মাত্র। যেমন ঐ কাঠের ঘড়ি। অর্থাৎ ঘড়ি তৈরির বিজ্ঞান এবং কৌশল যে স্তরে পৌঁছেছে তার পর থেকে যদি আরম্ভ করতে না পারি, তা হলে সে কাজে হাত দেওয়া অর্থহীন।

কিন্তু এ কথা মনের স্বদেশী দিক স্বীকার না করলেও মনের রসগ্রহণের দিককে ফাঁকি দেওয়া যায়নি। অর্থাৎ দিনের পর দিন শুধু নড়া দেখে যে সে কত অতৃপ্ত তা প্রকাশ পেয়েছে ঐ সিনেমা ঘরে তার অজ্ঞাতসারেই। কারণ যখনই কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে এক একটা নিসর্গ দৃশ্য (সম্পূর্ণ অকারণ, অথবা ঘুস হিসেবে) দেখানো হয়েছে তখনই দর্শকেরা হাততালি এবং চিৎকারে ঘর ফাটিয়েছে। এ যেন বদ্ধঘরে আটকে রেখে হঠাৎ খোলা হাওয়ায় ছেড়ে দেওয়া।

কিন্তু এদিকে বিদেশী ছবিতে গল্পের রস জমে উঠছে নিবিড়ভাবে, আমরা তা দেখেও হাততালি দিচ্ছি, আর তারই পাশে দেখছি পুতুলের খেলা। শুধু নড়া! কিন্তু এ নড়া যে সে নড়া নয়, তা কেবল স্বদেশী মন আমাদের মানতে দেয়নি।

তারপর একদিন হঠাৎ বিদেশী চিত্র সবাক হয়ে উঠল, এবং তা তাদের উন্নতির পর্যায়-ক্রমেই হ'ল, আর সেই সঙ্গে আমাদের কলের পুতুলও কথা বলবে ব'লে প্রস্তুত হ'ল।

শুধু তফাৎটা হ'ল এই যে বিদেশী নির্বাক ছবির ওটা হ'ল পরিণতি আর আমাদের ক্ষেত্রে ওটা হল অকালপক্বতা। অর্থাৎ আমরা কথা পেলাম নড়তে শিখেই। কাজেই নির্বাক ছবিতে আমাদের রস ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা লাভ করতে স্বভাবতঃই যতটা সময় লাগত, সে সময়ের বহুপূর্বে আমরা কথা পেয়ে গেলাম।

আবার দেশে সাড়া জাগল। আবার জাতীয় জাগরণের নতুন প্রমাণ পেয়ে গেলাম আমাদের পর্দায়-নড়া মানুষের মুখে কথা ফোটায়। যারা শুনল এ খবর, তারাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, বল কি? আমাদের লোকেরাও কথা বলছে? সিনেমায় কথা বলছে? বাংলা ভাষায় কথা বলছে?

আর কালবিলম্ব নয়, ছোটো, ছোটো, দলে দলে ছোটো, সিনেমায় আমাদের লোকেরা কথা বলেছে! সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! জাতি স্বাধীন হ'তে চলল সত্যিই, আর আমাদের ঠেকায় কে?

রকম সকম দেখে সিনেমাওয়ালারা মনে মনে বললেন, আমাদেরও কেউ ঠেকাতে পারবে না।

কথাটা মর্মান্তিকভাবে সত্য।

সিনেমাওয়ালাদের কেউ ঠেকাতে পারল না। সিনেমা-পর্দায় তাঁরা খাঁটি ভারতীয় লোকদের অনর্গল কথা বলাতে লাগলেন। যারা পর্দায় এতকাল শুধু নড়েছে, কথা বলেনি, তারা এখন নড়তে অস্বীকার ক'রে শুধু কথা ব'লে যেতে লাগল। যারা ছিল এতদিন বিশুদ্ধ দর্শক, তারা হ'ল এখন বিশুদ্ধ শ্রোতা! আগে সম্পূর্ণ বধির হয়ে ছবি দেখা যেত, এবারে এলো অন্ধদের পালা, কারণ দেখতে চোখের দরকার নেই, কানই যথেষ্ট।

এ যেন সিনেমার চূড়ায় উঠে স্বর্গে পৌছনোর চেষ্টা—ব্যাবেল অধিবাসীরা এককালে যে উদ্দেশ্যে চূড়া নির্মাণ করেছিল। ভগবান দিলেন শাস্তি, কথার খিচুড়িতে তারা হল বিভ্রান্ত। এই অতি-কথা এবং সামঞ্জস্যহীন কথার বিভ্রান্তি থেকে সিনেমাকে কি ক'রে মুক্ত ক'রে নড়াচড়ার সঙ্গে কথার পরিমাণ বেঁধে দেওয়া যায়, এবং সিনেমাকে কি ক'রে শিল্পের স্তরে টেনে নেওয়া যায় এ দুশ্চিন্তা কারো কারো মনে জেগেছে এতদিন পরে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অনধিকারীর ভিড়ে উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যাচ্ছে। প্রতিযোগিতা এমনি উগ্র হয়ে উঠেছে যে কারোই আর ভেবেচিন্তে কিছু করার ফুরসৎ নেই, তাই দৈহিক খাদ্যের বেলায় যেমন, মানসিক খাদ্যের বেলাতেও তেমনি, ভেজাল মেশানো চলেছে বেপরোয়াভাবে, এবং সে ভেজাল একমাত্র দুধের ভেজালের অনুপাতের

সঙ্গেই তুলনীয়। শুনছি কোনো কোনো ছবিতে সরকারী হাতেও ভেজাল মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই অবস্থা স্থায়ী হ'তে পারে না, এবং অনধিকারীর প্রতিযোগিতাও স্বভাবধর্মেই একদিন থেমে যেতে বাধ্য। কিন্তু তখন সিনেমার যথার্থ হিতৈষী আরও একটি প্রবল বাধা অনুভব না ক'রে পারবেন না।

সে বাধা তাঁদের নিজেদেরই সৃষ্ট বাধা। এখন তাকে শস্তায় নদী পারের সরঞ্জাম হিসেবে তাঁরা ব্যবহার করছেন, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সেই সরঞ্জাম ঘাড়ে বহন করতে হবে পাপের বোঝাস্বরূপ।

এ হচ্ছে গানের বাধা। এ বাধাকে এড়ানো দুঃসাধ্য। তারা আধুনিক যুদ্ধের ইনফিলট্রেশন-কৌশল জানে। তারা গোপন পথে এসে অভিনয়ের স্বচ্ছন্দ গতিপথ রোধ করে। সিনেমার কাহিনী-রচয়িতা, ডাইরেক্টর, ক্যামেরাম্যান সবাই একযোগে পথরোধ করলেও তারা অনুপ্রবেশে বাধা অনুভব করে না, তাদের 'মোরাল' বা মনোবল ভেঙে দিয়ে গান ঢুকে পড়ে। কারণ তাদের নেতা হচ্ছে শয়তান স্বয়ং। সে এসে বাধাদানকারীদের কানে কানে বলতে থাকে, "কি কাজ 'রিস্ক' নিয়ে? ছবিতে গানের জায়গা নেই? জায়গা করে দাও।"

শয়তানের জয় হয়।

আরও কতদিন হবে কে জানে!

(শারদীয় চিত্রবাণী, ১৯৪৮)

অতিরঞ্জন রাজনীতিতেও প্রয়োজন

অতিরঞ্জন রাজনীতিতেও প্রয়োজন এ কথা না ব'লে, বোধ হয় বলা উচিত : অতিরঞ্জন রাজনীতিতেই বেশি প্রয়োজন, এবং অনেক কষ্ট ক'রে এ বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়। কথাটায় হয়তো একটু অতিরঞ্জন হ'ল, কিন্তু তাতে বোঝবার পক্ষে সুবিধে হবে।

আসলে অতিরঞ্জন কথাটা আমরা অনেক সময়েই ভুল অর্থে ব্যবহার করি। যেন ওটা একটা অপরাধ, যেন প্রত্যেকটি জিনিসেরই, যে রং প্রকৃতি থেকে দেওয়া হয়েছে, মানুষের হাতের পুনর্গঠনেও ঠিক সেই রং বজায় রাখতে হবে, একটু এদিক-ওদিক হ'লে তা আর আর্ট হবে না। আর্ট কথাটা ব্যবহার করছি কারণ সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রশিল্প এবং রাজনীতি প্রত্যেকটি উচ্চশ্রেণীর আর্ট। রাজনীতির প্রচারসাহিত্য বা প্রচার বক্তৃতাও আর্ট। প্রচার বক্তৃতার তো বিশেষ নামই আছে—The Art of Persuasion.

কাজেই মানুষের সচেতন মনের পরিচালনায় যা কিছু রচনা করা হোক না কেন, আর্টের স্বভাব ধর্মেই তাতে অতিরঞ্জন থাকবেই। আর্টের বিচারে ঐ অতিরঞ্জনই স্বাভাবিক। অর্থাৎ এখানে অতিরঞ্জন মানে যথার্থ রঞ্জন।

এটি মৌলিক সত্য কথা।

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে রঙের আর শব্দের হট্টগোল। সব যেন পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। তাই কোনো একটা থেকে আর একটাকে আমরা পৃথক ক'রে দেখতে বা শুনতে পাই না। এরই মধ্যে যখন কোনো একটি রং বা ধ্বনি পৃথক হয়ে বেরিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, শ্রবণকে তৃপ্ত করে, তখন অবশ্যই তা অতিরঞ্জনের জন্যই হয়, কিন্তু আমরা তাকে অতি-রঞ্জন বলি কি ?

কিন্তু বলি বা না বলি, মনোযোগ আকর্ষণ করাতে হ'লে বেশি রং চড়াতে হয়ই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক ব্যঙ্গ রচনায় এক পাত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—'অমন মৃদু সম্ভাষণে কাজ হবে না, গলায় গামছা দিয়ে লোক টানতে হবে।'… কথাটি আমার বড়ই পছন্দ, কারণ এরই নাম রাজনৈতিক অতিরঞ্জন। কিন্তু আমি একে অতিরঞ্জন বলতে রাজি নই। গলায় গামছা দিয়ে লোক টানা রাজনীতির একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এরই নাম—The Art of Persuasion. কারণ মৃদু রঙের ছবি কেউ দেখে না, মৃদু ধ্বনির গানে কেউ মুগ্ধ হয় না, মৃদুভাষের সাহিত্য কেউ পড়ে না, মৃদু কথার উপদেশ কেউ শোনে না, গলায় গামছা দিয়ে সবাইকে টেনে চিৎকার ক'রে শোনাতে হয়; বাড়িয়ে বলতে হয়; এককে একশ' বানিয়ে দেখাতে হয়; তবে তো তা লোকের কাছে স্বাভাবিক মনে হবে।

রাষ্ট্রনীতিতে এর প্রয়োজন আছে নানা বিভাগে।

রাষ্ট্রনীতিতে বিভিন্ন দল থাকে। দলের প্রাধান্য দেখাতে হ'লে দলীয় নীতিকে বাড়িয়ে দেখাতে হয়, নইলে ভোটদাতাদের আকর্ষণ করা যায় না। বিভিন্ন দলের মধ্যে নিজ নিজ আদর্শ নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। অতিরঞ্জনের ক্ষেত্র তৈরি হয় এইখানে। এইখানে বিরুদ্ধ পক্ষের মাথায় ঢালতে হয় আল-কাতরা এবং নিজেদের মাথায় ঢালতে হয় আলকাতরা-জাত রং। একদিকে একেবারে ব্ল্যাক-আউট, অন্যদিকে রঙীন আলো। দলগুলোর পরস্পরের মধ্যে এইভাবে চলে দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতা। এতে কাজ হয়। ঝোঁকের মাথায় কোনো দিকেই সীমা রক্ষা করা যায় না, কিন্তু লোকে চমৎকৃত হয়। বিলেতে ভোট নিয়ে মারামারি লাঠালাঠি আগের দিনে সাধারণ ঘটনা ছিল। পথঘাট অতিরঞ্জিত হ'ত মানুষের রক্তে।

ইলেকশনের ব্যাপারে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বলতে মুখে কিছু আটকায় না, কারণ তার উদ্দেশ্য: তড়িৎ গতিতে শ্রোতার মনে চমক জাগিয়ে তাকে নিজের দলে টানা। একবার এক মনোনয়নপ্রার্থীর বিরুদ্ধ পক্ষ রটনা করছিল উক্ত মনোনয়নপ্রার্থী অতি নিষ্ঠুর, কারণ তিনি তাঁর স্ত্রীর রাজনৈতিক মতকে জোর ক'রে দাবিয়ে রেখেছেন। তিনি তখন এ কথার উত্তরে বললেন: "দেখুন,

আমি সত্য বলছি, প্রথমতঃ আমি কখনো আমার স্ত্রীর মতকে নিজের মত দিয়ে প্রভাবান্বিত করতে চেষ্টা করিনি। দ্বিতীয়তঃ আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কখনো রাজনৈতিক আলোচনা করিনি। তৃতীয়তঃ, আমার স্ত্রী রাজনীতির কিছুই জানে না। চতুর্থতঃ, আমি বিয়েই করিনি।"

যে লোকটি এঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল, এ কথার পর আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বিলেতের পার্লামেন্টে ডিসরেলি ও গ্ল্যাডস্টোনের মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রসিদ্ধ। কত গল্প প্রচলিত আছে তাঁদের সম্পর্কে। ডিসরেলি একবার দুর্ভাগ্য ও বিপর্যয়ের পার্থক্য বোঝাতে, বলেছিলেন, গ্ল্যাডস্টোন যদি কখনো টেমস-নদীতে পড়েন, তবে সেটি হবে দুর্ভাগ্য। কিন্তু কেউ যদি তাঁকে জল থেকে টেনে তোলে তা হ'লে সেটি হবে বিপর্যয়।

এ জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরস্পরের অতিশয়োক্তি বা অতিরঞ্জিত ভাষা-প্রয়োগ যতই থাক, তা সবসময়েই আর্টের সীমানার মধ্যে থাকে।

কোনো দেশের শাসক দলকে যখন বিরোধী পক্ষের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হয়, তখন জনসাধারণের, প্রতিপক্ষ কর্তৃক দূষিত দ্বিধাগ্রস্ত মনে, সাহস সঞ্চারের জন্য কিছু অতিরঞ্জনের সাহায্য নিতে হয়। কারণ প্রতিপক্ষ বা বিরোধী দল কর্তৃক শাসক দলকে ধিক্কার দেবার জন্য তাঁদের ত্রুটির দিকটিকে অত্যন্ত বাড়িয়ে তুলতে হয়।

এ ক্ষেত্রেও অতিরঞ্জন আর্টের সীমানার মধ্যে থাকে। কিন্তু আর এক জাতীয় রাজনৈতিক প্রচার বা প্রোপাগাণ্ডা আছে যা আর্টের সীমানা ছেড়ে ম্যাজিকের সীমানায় পৌঁছেছে। এটি অতিরঞ্জন নয়, কেন না অতিরঞ্জনে অতির বাড়াবাড়ি যতই থাক, তার মূলে কিছু পরিমাণ সত্য থাকেই। দৃষ্টিভঙ্গির তফাতে সত্যের চেহারা হয়তো বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন হয়ে পড়ে, কিন্তু তবু তা সম্পূর্ণ মূলবর্জিত নয়। মূলবর্জিত প্রচার হচ্ছে ধাপ্পা। কিন্তু তবু এই ধাপ্পা রাজনীতির ক্ষেত্রে আজ একটি বড় অস্ত্র।

এই ধাপ্পার প্রথম উদ্ভাবন হয়েছিল জার্মানিতে—প্রথম মহাযুদ্ধের সময়।

এর পাল্লায় প'ড়ে মিত্রপক্ষকে বড়ই নাকাল হতে হয়েছিল। এবং অবশেষে মিত্রপক্ষকেও পাল্টা প্রোপাগাণ্ডা অফিস খুলতে হয়েছিল আত্মরক্ষার জন্য।

হিটলার তাঁর 'মাইন কাম্ফ' নামক বইতে স্বীকার করেছেন নির্জলা মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডার একটি অত্যাবশ্যক অংশ। কারণ তাঁকেও, জার্মানির লোককে তাঁর দলে টানতে বহু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

তা হ'লে একবার ভেবে দেখুন, কত রাষ্ট্রজ্ঞানী শিক্ষিত মগজ এই বিভাগে অতিরঞ্জনের এবং ধাপ্পা রচনার কাজে নিযুক্ত। রাজনীতির এই দুটি প্রান্ত, একপ্রান্তে উচ্চাঙ্গের শিল্পসমর্থিত অতিরঞ্জন—আর একপ্রান্তে নিম্নস্তরের শিল্প-ধাপ্পা, যদিও ধাপ্পাকেও অতিরঞ্জন বলা যায় সেই অর্থে—যে অর্থে বার্নাড শ একবার কাগজে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ প'ড়ে বলেছিলেন খবরটা একটুখানি অতিরঞ্জিত।

সবশেষে আমি গত ৩১শে জুলাই প্রচারিত টোকিওর একটি খবর শোনাচ্ছি। খবরটি এই—"আজ জাপানের পার্লামেন্টের অধিবেশন দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে শেষ হয়। উর্ধ্বতন পরিষদের নিয়ামক কমিটির চেয়ারম্যান আহত হয়েছেন।"

অতএব শুধু রাজনৈতিক প্রচারে নয়, ক্রিয়াতেও যে অতিরঞ্জন প্রকট এ ঘটনা নিশ্চয় সেকথা সমর্থন করবে।

(বেতার জগৎ ১৯৫৫)

আলিপুরের চিড়িয়াখানা

আলিপুরের চিড়িয়াখানা নামটি কলকাতার নামের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে চিড়িয়াখানা বাদ দিয়ে কলকাতা শহরের কথা ভাবাই যায় না। বাংলাদেশে অন্তত এমন মানুষ বোধ করি কেউ নেই যে-মানুষ কলকাতা এসেছে অথচ চিড়িয়াখানা দেখেনি, অথবা কলকাতার নাম শুনেছে অথচ চিড়িয়াখানার নাম শোনেনি।

ছোট বড় সবাইকে সমানভাবে আনন্দ দেয় এই চিড়িয়াখানা। কিন্তু কেন দেয়? ছোটদের কাছে এটি একটি রূপকথার জগৎ। যে সব জন্তুর সম্বন্ধে তারা বইয়ে পড়েছে অথবা মুখে শুনেছে, তারা যে এমন বাস্তব মূর্তি নিয়ে হঠাৎ দেখা দিতে পারে তা হয়তো তারা দেখেও বিশ্বাস করতে চায় না, সব যেন একটা স্বপ্ন ব'লে মনে হয় তাদের কাছে।

বড়দের আকর্ষণ বহুবিধ। বাইরে থেকে এসে যারা প্রথম দেখছে, তাদের মনোভাব ছোটদের মতোই। অনেকে সেখানে যায় ছুটির আনন্দ উপভোগ করতে। মনোরম জায়গা; গেলে একটা আনন্দ পাওয়া যায়। কেউ আসে প্রাণী-বিজ্ঞানের ছাত্ররূপে। কেউ আসে ক্যামেরা নিয়ে। লেখক এই শেষোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত। তা ভিন্ন সবারই মনে মনে হয় তো এই কথাটি আছে যে, মানুষের সমাজ তো দেখা গেল, পশু সমাজে কিছুকাল বাস ক'রে দেখা যাক না কেমন লাগে।

চিড়িয়াখানার নিজস্ব উদ্দেশ্য অবশ্য একটা আছে। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাণীজগতের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এ পরিচয় শুধু নামের নয়, একেবারে কুলশীলের পরিচয়। চিড়িয়াখানাই প্রাণীবিজ্ঞানের ছাত্রদের একমাত্র ল্যাবরেটরি। তাদেরই সুবিধার জন্য পশুপাখীদের জাতি বা বংশ পরিচয় যথাস্থানে সব বৈজ্ঞানিক ভাষায় লেখা আছে। সাধারণ দর্শকের তা কাজে আসে না, তাদের পক্ষে চোখের দেখাই যথেষ্ট। তাই

শিক্ষার্থী ভিন্ন বাকী দর্শকেরা প্রায় সবাই সেখানে যায় শুধু দেখতে, জানতে নয়; এই দর্শকদের কাছে এদের শ্রেণী বিভাগ একটু ব্যাপক, অর্থাৎ তা প্রায় শ্রেণীহীন। টাইগার, লেপার্ড, পিউমা—সবই বাঘ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিংবা ময়ূর, বক, বাদুড় সবই পাখী। খুব সরল ব্যাপার, এর বেশি দরকার কি? কিন্তু বর্তমানে এদের পরিচয় যথাসম্ভব বাংলা ভাষাতেও লেখা হয়েছে, জানার আকর্ষণ বাড়বে হয়তো তাতে। বহু আগে থেকেই এই ব্যবস্থা থাকলে কত ভাল হ'ত।

আলিপুরের চিড়িয়াখানার বয়স হ'ল আজ প্রায় পঁচাত্তর বছর। এটি স্থাপিত হয় তৎকালীন লেফটেনাণ্ট গবর্নর রিচার্ড টেম্পলের চেষ্টায় এবং জনসাধারণের সহযোগিতায়। একটা স্থায়ী চিড়িয়াখানা যে হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে আন্দোলন চালান রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি। এটি সেই আন্দোলনেরই ফল বলা যেতে পারে। সরকারপ্রদত্ত ৩৩ একর জমির উপর এই চিড়িয়াখানা স্থাপিত হয়েছে। গবরমেণ্ট হাউসে এক এঞ্জিনীয়র ছিলেন, নাম এল. শোয়েণ্ডলার। তিনি উদ্যোগী হয়ে এর নক্সা এবং পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন।

কিন্তু ইতিহাস আলোচনা থাক। চিড়িয়াখানার কথা মনে হলেই একটা অদ্ভুত জগৎ চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে। দেশ-বিদেশের পশুপাখী মিলে এই জগৎ গ'ড়ে তুলেছে। কেউ বা স্বাধীন, কেউ বা অর্ধ স্বাধীন, কেউ বা স্বাধীনতা বর্জিত হয়ে এখানে বাস করছে। সেলিবিসের আনোয়া; অফ্রিকার হিপো, হাইর্যাক্স, জেব্রা, জিরাফ, সিংহ, গণ্ডার; গায়েনার স্কুইরেল মাংকি; ম্যাডাগাস্কারের লেমুর; অষ্ট্রেলিয়ার ক্যাঙারু; বৈকাল হ্রদের টীল; দক্ষিণ আমেরিকার অ্যালিগেটর, আরও কত কি। তাই আন্তর্জাতিক প্রাণী-মিলনক্ষেত্র এই চিড়িয়াখানা এত চমকপ্রদ।

চিড়িয়াখানা স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য যে এখানে নিয়মিত সিদ্ধ হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে (১) দর্শকদের অবসর বিনোদনের সুযোগ দেওয়া, শিক্ষা এবং আনন্দ দেওয়া। (২) প্রাণীদের স্বভাব-চরিত্র বৈজ্ঞানিক

রীতিতে পরীক্ষার এবং পশুপাখী সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় অনুশীলনের সুযোগ দেওয়া। সে সুযোগ ছাত্ররা নিয়ে থাকে।

এই সব উদ্দেশ্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটলে চিড়িয়াখানার চেহারা সাধারণ দর্শকের চোখেও বদলে যাবে হয় তো। এখন তো তারা শুধুই 'তামাসা' দেখতে আসে। দু আনার পয়সায় এর দামও কম নয়। তা ভিন্ন এখানকার দৃশ্যের মনোহারিত্ব মনকে অজ্ঞাতসারেই প্রসন্ন ক'রে তোলে, কারণ এ দৃশ্য রীতিমতো পরিকল্পনার সাহায্যে তৈরি।

বহু পল্লীবাসী এখানে নিয়মিত আসে। তারা খালি হাতে আসে না, পশুপাখীদের জন্য কিছু কিছু ছোলা, বাদাম বা কলা কিনে নিয়ে আসে। একটা শ্রদ্ধা ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাদের এই কাজের মধ্যে। তারা অসহায় বন্দীদের কিছু কিছু খেতে দেওয়াকে পুণ্যের কাজ ব'লে মনে করে। এই ভাবে তাদের মনের অগোচরেই চিড়িয়াখানা তাদের কাছে একটি তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। ছুটি উপভোগের পক্ষে জায়গাটি যাতে আরও মনোরম হয় সেজন্য বর্তমানে নতুন ক'রে সব ভাঙাগড়ার কাজ চলছে, প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও রকমফের হচ্ছে।

কোনো একটি জায়গা বেছে নিয়ে চুপচাপ ব'সে দর্শকদের পর্য্যবেক্ষণ করতে আমার ভাল লাগে। দলে দলে পল্লীবাসীরা একে একে দেখে বেড়াচ্ছে সব প্রাণীদের। স্ত্রীপুরুষ শিশুবৃদ্ধ। তাদের সবারই চোখে শিশুর বিস্ময়। মুখে কথা নেই, নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আর জেব্রাকে হরিণকে হাতীকে খেতে দিচ্ছে। ফিরে গিয়ে কত গল্প করবে তারা, যারা দেখেনি তাদের কাছে। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে কেন জানি না এদের যেন বেশি মানায়। এদের বিস্ময় আমার মনে সঞ্চারিত হয়, ওদের দৃষ্টিতে চিড়িয়াখানাকে নতুন ক'রে দেখার চেষ্টা করি। নতুন ক'রে ভাল লাগে।

চিড়িয়াখানায় বন্দী পশুপাখীদের দেখলে মনে কিছু বেদনা জাগা স্বাভাবিক। বিশেষ ক'রে সিংহ বাঘ ভালুক প্রভৃতি শক্তিশালী জন্তু কি রকম লোহার খাঁচায় বন্দী হয়ে জীবন কাটাচ্ছে বিনা অপরাধে। ওরা যতটা খেতে পারে

ততটা খাবার কি ওরা পায়?—পায় না। কিন্তু শুয়ে শুয়ে কিংবা নির্দিষ্ট একটুখানি জায়গার মধ্যে মাঝে মাঝে নড়েচড়ে বেড়িয়ে দিনরাত যদি খাবার স্বপ্ন দেখে, তা হলে বন্দীজীবন অসহায় মনে হবেই। কিন্তু যদি পেট ভ'রে খেতে পেত তা হ'লে হয় তো বেশি দিন বাঁচত না। নিষ্কর্মা জীবনে কেবল খাওয়া মানুষদের মধ্যেই ক'জন পায়? ওরা যখন বনে থাকে তখনই কি সব সময় খেতে পায়? পরিশ্রম ক'রে শিকার ধরতে হয়, কখনো মেলে, কখনো মেলে না।

কিন্তু তবু এদের রাক্ষসসুলভ ক্ষিধে সত্ত্বেও যা পাচ্ছে তাইতে চলে যাচ্ছে এক রকম। অসুখ বিসুখে খুব যে ভোগে বা অকালমৃত্যুতে প্রাণ হারায় এমন তো শোনা যায় না। ওদের একমাত্র অসুবিধা এই যে, যারা ওদের দেখতে যায় তারা ওদের খাদ্যশ্রেণীভুক্ত। ছোট ছোট ছেলেদের দেখে বাঘের যে লালসা জেগে উঠতে দেখেছি তা সত্যিই পাশবিক।

এখানে সিংহ, বাঘ, ভালুক, কুমীর, সাপ প্রভৃতি কয়েকটি হিংস্র প্রাণী সত্যকার জেলখানায় থাকে। তা ভিন্ন আর সবাই প্রায় স্বাধীন। তাদের পরিবেশও যেমন স্বাভাবিক, চলাফেরার জায়গাও তেমনি প্রশস্ত। গণ্ডার ভয়ঙ্কর জন্তু হওয়া সত্ত্বেও অনেকটা স্বাধীন। একটি গণ্ডার তো বেশ ভাব জমিয়ে ফেলেছে মানুষের সঙ্গে, হাঁ করেই আছে—যেন প্রকাণ্ড ভিক্ষার ঝুলিখানা মেলে ধরেছে দর্শকদের কাছে। এর চোখ দুটি অদ্ভুত। কেমন যেন বিষণ্ণ। যেন জীবনের দুঃখ ভোলার জন্য সব সময় নেশাগ্রস্ত হয়ে আছে। অথচ একটু দূর থেকে দেখলে সবসুদ্ধ কি ভয়ঙ্কর। গায়ে মোটা বর্ম আঁটা। পিছন দিকটা কিছু হাস্যকর, হাফ-প্যান্ট পরার ভঙ্গি। বিবর্তনের গোড়ার দিকে বর্মহীন লোমশ গণ্ডারের চিহ্ন মেলে, তারা এখন নিশ্চিহ্ন।

সমস্ত চিড়িয়াখানার মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে আশ্চর্যদর্শন এবং নিরীহ প্রাণী জিরাফ এবং সবচেয়ে কুৎসিত জলহস্তী বা হিপো। হিপোর হিংস্রতা এবং এক বালিকার অসাবধানতার যোগাযোগে কয়েক বছর আগে বালিকাটি প্রাণ হারায়। বর্তমানে হিপোর কয়েদখানা আরও নিরাপদ করা হয়েছে। বামন-হিপো অন্যত্র থাকে।

জিরাফ-ঘর মাঝখানে কিছুকাল শূন্য ছিল, আবার সেখানে নতুন জিরাফ আনা হয়েছে। এর কচি মুখের দিকে তাকালেই মায়া হয়, আদর করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সিঁড়ি লাগাতে হবে মুখে হাত বুলোতে। তথাপি সে হয় তো বলবে, "আমি এ সব পছন্দ করি না।" এই দীর্ঘগ্রীবগণ আত্মরক্ষায় হরিণের চেয়েও পটু। এরা এদের আদি বাসস্থান আফ্রিকার জঙ্গলে দল বেঁধে বাস করে, পাঁচ থেকে পঁয়তাল্লিশ এক এক দলে। ছুটতে পারে খুব। ক্ষিপ্র গতিতে ঘোড়াকে হার মানায়। লড়াই আসন্ন হ'লে পিছনের পা দিয়ে এমন আঘাত হানতে পারে যাতে অনেক সময় পশুরাজকেও পিছিয়ে আসতে হয়। লেজ তুলির মতো।

জেব্রা আর এক বিচিত্র প্রাণী। এরও আদি বাস আফ্রিকায়। গল্প শোনা যায় একটি ছোট মেয়ে জেব্রা দেখে তার মাকে বলেছিল, "ঘোড়া সাঁতারের পোষাক পরেছে কেন, মা?"

খুব বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে হালে এসেছে এক জোড়া জাপানী স্যালামাণ্ডার। এরা উভচর। কিন্তু চিড়িয়াখানায় এদের দেখা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। মহাপুরুষদের মতো বিশেষ সময়ে দর্শন দেন। খুব যত্নে তৈরি কুঞ্জভবনে অন্ধকার পরিবেশে শেওলাভরা জলাশয়ে লুকিয়ে বাস করছে। মাথার উপব বিজলি পাখা ঘুরছে অবিরাম। হিরোহিতোর মতো সূর্যবংশীয় নয়, বোঝাই যায়। রাত্রি ভিন্ন নাকি জল থেকে বেরোয় না. সূর্যালোক সহ্য হয় না। চিড়িয়াখানার বর্তমান সুপারিণ্টেনডেণ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ লাহিড়ী আমাদের জন্য বিশেষ ভাবে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য তাদের জল থেকে তুলে ধরার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যুতের ক্ষীণ আলোতে বাইরে থেকে দেখে আমাদের চোখে যেটুকু ছাপ পড়ল তাতে মনে হ'ল শোল মাছের চারখানা পা থাকলে যেমন দেখায় তেমনি, তার বেশি আর কিছু মনে পড়ে না। ক্যামেরা এখানে অচল।

রেপটাইল হাউস বা সরীসৃপ গৃহ দর্শকদের একটা মস্ত বড় আকর্ষণ। ওখানে ভিড় লেগেই আছে। কুমীর আর সাপ, মানুষের দুই পরম শত্রু

ঐখানে থাকে। মানুষের অদৃশ্য শত্রু জীবাণুদেরই মতো এরাও জলে এবং স্থলে অদৃশ্য থাকে, অতর্কিত আক্রমণে মানুষকে পরাভূত করে। সেজন্য নিরাপদে কাছে থেকে এদের দেখতে পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয় অবশ্যই।

আগে এটি শুধু সাপের ঘর ছিল, ১৯০৭ সালে কুমীরের স্থান ক'রে দেওয়া হয়। সুতরাং দর্শকদের কাছে এখন এটি প্রায় শাপে বর হয়ে দাঁড়িয়েছে। উভচর কচ্ছপ শুধু বাইরে পৃথক জায়গায় থাকে। এই জেলখানায় বাসের জন্য তার কোনো গরজ নেই।

বড়দের মধ্যে হাতী একটি বড় আকর্ষণ। হাতী দুর্লভদর্শন, অথচ তা হওয়া উচিত ছিল না। কলকাতার পথে মালবোঝাই বড় বড় ট্রাক অথবা শত শত যাত্রীপূর্ণ দোতলা বাস চলার অনুমতি পেয়েছে, হাতী কেন পায় নি তা বোঝা যায় না। চারদিকে দড়ি ঝুলিয়ে দিলে কান, লেজ, শুঁড়, দাঁত ও দড়ি মিলিয়ে প্রতিটি হাতী অন্তত পঞ্চাশ জন যাত্রী বহন করতে পারত। ঝুলে ঝুলে যাওয়া সবারই অভ্যাস হয়ে গেছে।

ডুমরাওন গৃহে নানা জাতীয় মর্কটদের বাস। কাছেই খালের বাইরে গিবন অনেকটা স্বাধীন—একখানি হাতে ডাল ধ'রে ঝুলে থাকে, দেখতে বেশ মজার।

অটার বা ভোঁদড়দের জন্য সুন্দর একটি জলাশয় আছে। ওখানেও ভীষণ ভিড় দর্শকদের। কিন্তু বড় থেকে ক্রমশঃ ছোটর দিকে বৈচিত্র্য অনেক বেশি, বিশেষ করে পাখীদের মধ্যে। তাদের পরিচয় জানতে পারলে সাধারণ দর্শকেরা আরও মনোযোগের সঙ্গে পাখী দেখতে পারত। পেলিক্যান, ফ্ল্যামিঙ্গো এবং বক হাড়গিলে প্রভৃতি যারা নিজেরাই নানা রকম স্টাইলে নিজেদের দেখায় তাদের ভিন্ন অন্য পাখীদের প্রতি দর্শকদের আকর্ষণ স্বভাবতই কম। এ বিষয়ে চিড়িয়াখানা থেকে বাংলাভাষায় এবং ইংরেজী হিন্দী ও অন্যান্য ভাষায় পশুপাখীদের পরিচয়-পুস্তিকা প্রকাশ করা উচিত, করলে তা লোকে আগ্রহের সঙ্গে কিনবে এবং তার মুনাফায় পশুপাখীদেরই লাভ হবে বেশি।

চিড়িয়াখানায় আর একটি মজার ব্যাপার আছে। এখানে বাইরে দুটি প্রাণীসম্প্রদায় স্বাধীনভাবে বাস করে। বাদুড়, ও এক জাতীয় হাঁস। এরা সম্পূর্ণ অনাহূত, কিন্তু বর্তমানের বাসস্থানের দুর্মূল্যের দিনে নিজেদের জন্য একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করে নিয়েছে। চিড়িয়াখানার সাতেও নেই পাঁচেও নেই, কারও প্রতি কোনো 'অব্লিগেশন' নেই, বরঞ্চ অন্যান্য প্রাণীদের মতো দর্শনীয়ের দলে ভিড়ে যাওয়াতে চিড়িয়াখানাই ওদের প্রতি কৃতজ্ঞ। জিরাফ-ঘরের কাছে কয়েকটা গাছে বাদুড়েরা ঝুলে থাকে। আর ঐ হাঁসেরা একসঙ্গে হাজার হাজার উড়ে আসে কোন্ দূর দেশ থেকে, এসে চিড়িয়াখানার হ্রদে কচুরিপানার মতো আবরণ বিছিয়ে দেয়, তার পর খেয়াল মতো উড়ে চ'লে যায় হাজার হাজার কালো বিন্দুতে আকাশ চিহ্নিত করতে করতে।

চিড়িয়াখানায় দর্শনীয় প্রাণী এত আছে যে তাদের ভাল ক'রে দেখতে গেলে বহুকাল কেটে যাবার কথা। যারা এক বেলার জন্য এসে তাড়াতাড়ি গোটাকতক প্রাণী দেখে চ'লে যায় তাদের কিছুই দেখা হয় না। ভাল ভাবে দেখতে গেলে কৃপণের মতো একটু একটু ক'রে দেখতে হয়।

চিড়িয়াখানার মূল উদ্দেশ্য যা চিড়িয়াখানার বইয়ে লেখা আছে, তার সঙ্গে আরও একটা যোগ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার সুযোগ দেওয়ার সঙ্গে চিত্রশিল্পীদের স্কেচিংএর সুযোগ দেওয়া। সব দেশের চিড়িয়াখানাই এ সুযোগ দেয় এবং চিড়িয়াখানাই পশুপাখী আঁকতে শেখার প্রধান স্থান। কলকাতাতেও তাই। ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলাও এখানকার একটি বড় আকর্ষণ (যেমন লেখকের)।

এখানে শীতকালে প্রাকৃতিক দৃশ্য আরও মনোরম হয়ে ওঠে। বর্ষাকালে প্রায় সবই সবুজ-দৃশ্য, কিন্তু শীতকালে সেই সবুজ ক্ষেত্রগুলি বিচিত্র বর্ণে ছেয়ে যায়। তখন চিড়িয়াখানার আকর্ষণ আরও বাড়ে, কত রকম ফুল যে ফোটে এর বাগানে বাগানে। তখন নানারঙের প্রজাপতি (মানবীয় প্রজাপতিও বটে) এসে ভিড় করে সব ফুলের লোভে লোভে। তখন দর্শকদের আকর্ষণ পশু পাখী ও পুষ্পের মধ্যে প্রায় সমান ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

কিন্তু চিড়িয়াখানা প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার যে, শহরে লোকবৃদ্ধি হয়েছে অসম্ভব রকম, চিড়িয়াখানাতেও তাই ক্রমশঃ দর্শকের ভিড় বাড়ছে। এই ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি ক'রে ঘুরে বেড়ানোর সময় স্বভাবতই মনে হয় চিড়িয়াখানার পরিসর যদি আরও বৃদ্ধি করা যেত! অল্প গোটাকতক প্রাণীর সাহায্যে যে যুগে এই চিড়িয়াখানা পরিকল্পিত হয়েছিল, সে যুগ বহুকাল পার হয়ে গেছে। পশুদের রক্ষার পদ্ধতিও সেকেলে হয়ে পড়েছে, বিশেষ ক'রে বাঘ, সিংহ প্রভৃতি শক্তিশালী জানোয়ারদের যেভাবে কয়েদ ক'রে রাখা হয়েছে তাতে ওদের দেখে ঠিক তৃপ্তি পাওয়া যায় না। এখানে হাঁসকে যেমন তার স্বাভাবিক পটভূমিতে দেখতে পাই, জলে স্থলে যেমন খুশি ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাঘ সিংহ প্রভৃতিকে তেমন দেখতে পাই না। মানুষের পরিচয় যেমন আলিপুর জেলে পাওয়া যায় না, পশুদের পরিচয়ও তেমনি আলিপুরের এই দ্বিতীয় জেলে পাওয়া যায় না। এ ব্যবস্থা অবশ্যই খুব সুবিধাজনক, কিন্তু এ ব্যবস্থা স্বভাবতই আনন্দদায়ক নয়।

শহরের মধ্যে চিড়িয়াখানার এ চেহারা অবশ্যম্ভাবী, প্রয়োজনীয়ও বটে, কিন্তু জু গার্ডেন ছাড়াও অন্যান্য দেশে যেমন অতিরিক্ত ন্যাশনাল পার্ক আছে বাংলাদেশের কি সে রকম হ'তে পারে না? ন্যাশনাল পার্ক আফ্রিকাতেও আছে। ব্রিটেনে জুলজিক্যাল সোসাইটির অধীন লণ্ডন জু আছে, এবং ঐ সঙ্গে 'হুইপস্নেড পার্ক' আছে। এই জাতীয় পার্কে জন্তুরা নিজ নিজ স্বাভাবিক পরিবেশে বাস করতে পায়।

প্রসঙ্গত বলা উচিত যে আমাদের দেশে বন্যজন্তুদের রক্ষাব্যবস্থা খুব ভাল নেই। 'গেম রিজার্ভ' বা 'স্যাংচুয়ারি' নামে মাত্র আছে, শোনা যায় শিকারলোভীরা অন্যায় ভাবে সে সব জায়গায় বাঘ বা হরিণ মেরে থাকেন। এ কথা সত্য হ'লে এদের মধ্যেকার কোনো কোনো জাতি বা সম্প্রদায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, সে জন্য আইনের কড়াকড়ি যেমন হওয়া উচিত তেমনি শিকারীদের মধ্যেও এ বিষয়ে শিক্ষাপ্রচার দরকার। এর

কোনোটাই সম্ভব না হ'লে ভয়ের কথা। সেইজন্যই অন্যান্য দেশের অনুকরণে এদেশে ন্যাশনাল পার্ক হওয়া দরকার।

কিন্তু কে করবে? যে দেশে মানুষের ব্যবস্থা নিয়ে রাষ্ট্র বিব্রত হয়ে পড়েছে সে দেশে পশুর ব্যবস্থা কবে হওয়া সম্ভব তা কল্পনা করা কঠিন। তবে পশুদের সপক্ষে এটু বলা যায় যে, তাদের মানুষের মতো প্রতিবাদের ভাষা নেই, কখনও-সখনও দু'একটা মানুষ মেরে প্রতিবাদ জানায় মাত্র। ইতিমধ্যে জঙ্গলে বেপরোয়া পশুশিকার যদি সত্যই নিয়ন্ত্রিত হয় তা হলেই সেটি সুখের বিষয় হবে। গত যুদ্ধের সময় বিদেশী সৈন্যরা পশুজীবন নিয়ে যথেষ্ট খেলা করেছে শোনা যায়। হিমালয়-নিম্ন অরণ্যে লোকমুখে শুনেছি তারা নাকি ময়ূরবধ করেছে বেপরোয়া। ঠিক আমাদের দেশের অরণ্য-বধের মতোই। তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বন-মহোৎসব হয়ে গেল আনুষ্ঠানিকভাবে। এই বন-মহোৎসব যদি একটি দিনের তিথিপালন না হয়, তা হ'লে ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ, কিন্তু জন্তুদের মধ্যে যদি কোনো জাতি বা সম্প্রদায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তখন কিন্তু আর জন্তুমহোৎসব বা অধিক-জন্তু-ফলাও আন্দোলনে কিছুই হবে না।

এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের আন্দোলন বাঞ্ছনীয়। ইতিমধ্যে আলিপুরের চিড়িয়াখানা দীর্ঘায়ু হোক, এবং 'আরও ভাল পাই নি কেন' ব'লে ওখানকার পশু-পাখীরা যেমন 'অনুতাপ' করছে না, আমরাই বা করি কেন?

(প্রবাসী, ১৯৫০)

পরীক্ষা বিভ্রাট

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ে এবারে এই ১৯৪৯ সালে যে রকম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে এ রকম বোধ হয় আর কখনও হয়নি। শিক্ষাব্রতী, অভিভাবক, পরীক্ষিত ছাত্রছাত্রী এবং সংবাদপত্র সবাই এবারের ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষার ফল ও ম্যাট্রিকিউলেশন বাংলা দ্বিতীয় পত্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

ইণ্টারমীডিয়েটে বহু পরীক্ষার্থী এবারে ফেল করেছে, এতে মুখ্যভাবে ক্ষতি হয়েছে পরীক্ষার্থীদের এবং তাদের অভিভাবকদের। দেশের ক্ষতি হয়েছে কি না এখনও তার হিসাব নেবার সময় আসেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য-ভাবে কোনো ক্ষতি হয় নি, কেন না ফেলের পরিমাণ যতই হোক ফীয়ের পরিমাণ ঠিক আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় তা অগ্রিম আদায় করেছেন। পরীক্ষকেরাও তাঁদের প্রাপ্য পেয়ে যাবেন যথা-সময়ে। উপরন্তু কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষায় এবারে স্বভাবতই অনেক বেশি পরীক্ষার্থী থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় অনেক বাড়বে, পরীক্ষকরাও আর একবার ফী পাবার সুযোগ পাবেন। সুতরাং দেখা যায়, বেশি ফেল করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে হাতে কিছু লাভ হয় এবং সেই সঙ্গে পরীক্ষকদেরও লাভ হয়। গৌণভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ও পরীক্ষকদের ক্ষতি হ'তে পারে এই যে, বেশি ফেল করায় পরীক্ষা যদি বিভীষিকার আকারে দেখা দেয় তা হ'লে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ভবিষ্যতে কমে যেতে পারে। তবে এটা হল জল্পনার বিষয়। অতএব বেশি ফেল করার জন্য যাঁদের অব্যবহিত ক্ষতি হ'ল, ক্ষোভ প্রকাশ স্বভাবতই তাঁদের পক্ষ থেকে বেশি হয়েছে।

অনেকে মনে করেন এবারের ফেলের সংখ্যাটা আকস্মিক। তাঁদের ধারণা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের পক্ষে কঠিন হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নপত্র কঠিন বা সহজ এ প্রশ্ন তোলার আগে নিশ্চিতভাবে জানা দরকার—শিক্ষার যে মান

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাওয়া হয় সেই মান কলেজের পড়ায় বজায় থাকে কি না। তা যদি না থাকে তবে পরীক্ষার্থীদের বদলে কলেজের শাস্তি হওয়া উচিত। আর যদি বোঝা যায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যত পাঠ্য নির্দিষ্ট হয়েছে তত পাঠ্য ঠিকমতো পড়াবার সময় নেই, কোনো কলেজেই পড়ানো সম্ভব নয়, তা হ'লে পাঠ্যের বোঝা কমিয়ে দেওয়া উচিত, আর না হয় প্রশ্নপত্র তৈরির সময় সেই কথাটা স্মরণ রাখা উচিত। কলেজে যে সবটা পাঠ্য পড়ানো যায় না তা সবাই জানেন। সুতরাং পরীক্ষার্থীরা শেষ পর্যন্ত অপ্রস্তুত থাকে। এমন অবস্থায় কলেজের উচিত পরীক্ষার্থীদের কাছে সে কথা স্পষ্ট ক'রে ব'লে দেওয়া, অথবা তাদের শেষ পরীক্ষা দেওয়ায় বাধা দেওয়া। কারণ এটা কলেজেরই ত্রুটি। পরীক্ষার্থীরা কিন্তু এর জন্য দুঃখিত হয় না। তারা বলে না যে আমরা প্রস্তুত নই, আমাদের পাঠাবেন না। তারা মনে করে কলেজের ত্রুটি তারা নিজ ক্ষমতা বলে ঢেকে দিতে পারবে। তার জন্য দরকার হ'লে পরীক্ষার হলে টুকতেও ইতস্তত করে না। তারা তাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় পাঠানোর জন্য কলেজের প্রতি ক্ষুদ্ধ না হয়ে ভুল ক'রে কৃতজ্ঞ হয়।

কিন্তু এ বিষয়ে কলেজের পক্ষ থেকেও কিছু বলবার আছে। কারণ পাঠ্যের সবটা কলেজ থেকেই পড়িয়ে দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কলেজে শুধু পড়ার ভঙ্গিটা ধরিয়ে দেওয়া হয়, কি ভাবে কোন্ বিষয় পড়তে হবে কলেজে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয় মাত্র, যাতে ছাত্ররা সেই ইঙ্গিত পেয়ে নিজেরা বাড়িতে ব'সে সবটা পড়ে নিতে পারে। কারণ কলেজে বছরে প্রায় ছমাস ছুটি থাকে। ছুটি বাদে যে অল্প সময় ক্লাসের জন্য পাওয়া যায় তাতে প্রতি ছাত্রের পিছনে একজন ক'রে অধ্যাপক থাকলেও সবটা পাঠ্য পড়ানো যায় কি না সন্দেহ। কলেজে থাকে দেড়শো দুশো ছাত্রের ক্লাসে একজন অধ্যাপক।

এখন প্রশ্ন এই যে, ক্লাসে কি ভাবে পড়তে হবে তার ইঙ্গিত পাওয়াই কি যথেষ্ট। এই সম্পর্কে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় সে হচ্ছে এই যে,

ছাত্রের মনে পড়ার গরজ জাগাবার মতো অবস্থা পূর্বে কখনও সৃষ্টি করা হয়েছে কি না। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রের মন সক্রিয় হয়ে ওঠে কি না। পথের একটুখানি ইঙ্গিত পেলে বাকী পথটুকু আপন গরজে পার হবার জন্য উৎসাহিত হয়ে ওঠে কি না। স্কুল থেকে সে এই পদ্ধতির শিক্ষা পেয়ে আসছে কি না। কলেজে এসেও পাচ্ছে কি না।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, গোড়ায় গলদ। কারণ অধিকাংশ স্কুলে পড়ানোর আদর্শ নিচু। ছেলেরা যে পড়ায় অমনোযোগী হয় তার কারণ শিক্ষকেরা নিজ নিজ বিষয়কে তাদের কাছে লোভনীয়রূপে ইণ্টারেস্টিং ক'রে তুলতে পারেন না। বিবিধ জ্ঞানলাভের জন্য যে সব পাঠ্য নির্দিষ্ট থাকে তার কোনোটাই ছাত্রের মনে বিরূপতা জাগাতে পারে না, বরঞ্চ সেই সব পাঠ্য-পুস্তক উপলক্ষ ক'রে শিক্ষকদের উচিত নিজ নিজ বিষয়ে ছাত্রদের মনে প্রবল উৎসাহ জাগিয়ে তোলা, যাতে তারা আর সব ভুলে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে আরও বেশি জ্ঞানলাভে উৎসুক হয়ে ওঠে। শিক্ষকেরা যদি পড়াবার এই কৌশলটি জানতেন তা হলে ছাত্রদের শিক্ষাজীবন সার্থক হত। কিন্তু ক্লাসে নীরস পাঠ, ধমকানি এবং অনেক ক্ষেত্রে তার সঙ্গে বেত্রাঘাত, এই সব মিলে যে conditioned reflex-এর সৃষ্টি হয় তাই তাদের মনে পাঠের প্রতি আজীবন বিরূপতা জাগিয়ে রাখে। এ শিক্ষার মধ্যে নিজের বুদ্ধিতে নিজের আনন্দে কিছু ভেবেচিন্তে পড়ার ব্যবস্থা কমই আছে। এবং আরও গোড়ার দিকে যদি তাকানো যায় তা হলে দেখা যাবে সেখানেও ছোট ছোট ছেলেরা বেত্রাঘাতের সঙ্গে "জল মানে সলিল," "পুস্তক মানে গ্রন্থ" মুখস্থ করছে। বাস্তবের সঙ্গে পরিচয়হীন এক প্রস্থ শব্দের আর এক প্রস্থ প্রতিশব্দ মুখস্থ করা দিয়ে যে শিক্ষার শুরু, তার পরিণাম স্বচিন্তাবর্জিত অপরের লেখা নোট মুখস্থ ভিন্ন আর কি হতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ও এ বিষয়ে সচেতন তাই ম্যাটিকের ছেলেকে "শিক্ষার উদ্দেশ্য" সম্পর্কে রচনা লিখতে দেওয়া হয়। যা একমাত্র দেশের অভিভাবকদের ভাববার বিষয় সে সম্পর্কে ছোট ছেলেমেয়েদের ভাবতে দিলে কিছু অস্বাভাবিক

বোধ হবে, কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য তাদের জানবার কথা নয়, তাই তারা যাতে পরের লেখা রচনা মুখস্থ লিখতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেই উস্কানি দেওয়া হয়। অর্থাৎ গোড়া থেকে শুরু ক'রে কলেজের ক্লাস পর্যন্ত অন্যের লেখা রচনা বা ব্যাখ্যা মুখস্থ ক'রে পাস করার এই ব্যবস্থা আমাদের একটি প্রথারূপে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই ক্লাসে শিক্ষক বই শেষ করুন বা না করুন, ছাত্ররা জানে যে প্রশ্নও এমন আসবে নোট মুখস্থ থাকলেই যার উত্তর লেখা যায়, নিজের চিন্তা বা বুদ্ধিতে কিছুই করতে হয় না। অন্তত মুখস্থ না থাকলে টুকে লেখা যায়।

শিক্ষার মোটামুটি চেহারা এই। বিশ্ববিদ্যালয়েরও এটা জানা আছে, পরীক্ষার্থীরও জানা আছে। সুতরাং উত্তর লেখার সময় যদি কেউ স্মৃতিশক্তির দুর্বলতাবশত মুখস্থ লিখতে না পেরে বই থেকে টুকতে শুরু করে, তবে সে যে এই শিক্ষা পদ্ধতির যে প্যাটার্ন, তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে একথা বলা যায় না। কারণ নোট মুখস্থ ক'রে পরীক্ষা পাস করা যায় এ কথা সকলেই জানে। সে ক্ষেত্রে অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কার্যত একমাত্র স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। যদি জ্ঞানের পরীক্ষা হ'ত তা হলে পরীক্ষার প্যাটার্ন এবং শিক্ষাদানের চেহারা প্রাথমিক শ্রেণী থেকে শুরু ক'রে কলেজ পর্যন্ত অন্য রকম হ'ত। সুতরাং যে বৎসর স্মৃতিশক্তির পরীক্ষার ব্যতিক্রম ক'রে দু'একটি প্রশ্ন জ্ঞানের পরীক্ষার সীমানায় আসে, অর্থাৎ যার উত্তর প্রচলিত নোট বইতে পাওয়া যায় না, সেই বৎসর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে হঠাৎ এ রকম প্রশ্ন করা সমীচীন কি না ভেবে দেখা দরকার। আমাদের দেশে এত ছাত্রছাত্রী যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেয়, তারা সবাই কি জ্ঞানলাভে ব্যাকুল? তারা সবাই কি ইংরেজী বাংলা বা সংস্কৃত সাহিত্য ভালবেসে পড়ে? তারা কি সবাই লজিক, সিভিক্স, বটানি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি বাইওলজির জ্ঞান লাভের জন্য উন্মাদ? সবাই যে উন্মাদ নয় তা সবাই জানেন। তবে তারা পড়ে কেন? পড়ে এই জন্য যে হয় তো কোনো রকমে বি-এ পর্যন্ত পড়তে পারলে কোনো একটা চাকরি খুঁজে নেওয়া সহজ হবে। গোড়া থেকেই অন্য কোনো বিভাগ এদের জন্য উন্মুক্ত থাকলে এরা

কখনও ইণ্টারমীডিয়েট বা বি-এ পড়তে আসত না। সাহিত্য দর্শন ইতিহাস ইত্যাদি প'ড়ে সাধারণ চিঠিপত্র লেখা, চিঠির খামে ঠিকানা লেখা, ক্যাশমেমো লেখা, অথবা ত্রৈরাশিক সীমার মধ্যে কিছু হিসাব লেখার চাকরি পেলেই তারা খুশি। শকুন্তলার পতিগৃহে গমন, প্রটেস্ট্যাণ্ট রিফরমেশনে মার্টিন লুথারের স্থান, শাইলকের দুঃখ, প্রভৃতি জীবনে তাদের আর কোনো কাজে লাগল না। কিন্তু ঐ খামের উপর ঠিকানা লেখার চাকরিটি পাবার জন্য তাদের বি-এ বা এম-এ পাস করতেই হবে। সুতরাং তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত জেনেই চাকরি পাবার সুবিধার জন্য সাহিত্য দর্শন ইতিহাস ইত্যাদি বাধ্য হয়ে পড়ে। এমনি অবস্থায় পরীক্ষার সময় যদি তারা বই টোকে তা হ'লে, পড়া, পরীক্ষায় পাস করা, চাকরি পাওয়া ইত্যাদি মিলিয়ে বাঙালী যুবকের যে জীবন-ইতিহাস রচিত হয়, তার প্রতি সে কি গুরুতর বিশ্বাসঘাতকতা করে?

আসল কথা প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর এবং শিক্ষার সঙ্গে জীবিকার যে গুরুতর অসামঞ্জস্য তা দূর না হ'লে পরীক্ষা রীতির আকস্মিক পরিবর্তন সমাজ-জীবনে গুরুতর বিপর্যয় ঘটাবেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে যত ছাত্র পড়ে তাদের মধ্যে হাজারকরা দুতিনজন ছাত্র হয়তো সাধারণ উচ্চশিক্ষার উপযোগী। ম্যাট্রিক পাস করার পর থেকে যদি বাছাই ক'রে, উদ্দেশ্য বিচার ক'রে ছাত্র ভর্তি করার নিয়ম থাকত এবং যে সব ছাত্র সাহিত্য বা দর্শন বা বিজ্ঞান প্রেমিক নয় তাদের জন্য অন্যান্য বহু পথ উন্মুক্ত থাকত এবং সেই সব পথে গেলে তাদের জীবিকার সংস্থান হ'ত, তা হ'লে হাজার হাজার ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেপরোয়াভাবে স্থান ক'রে দেওয়া চলত না। কেউ হয় তো মোটর মেকানিক হবে, কেউ হয় তো দোকানের অ্যাসিস্টাণ্ট হবে, কেউ হয় তো বা (বর্তমানে পথ উন্মুক্ত হওয়ায়) সেনা বিভাগে বা নৌবিভাগে যাবে, তাদের প্রত্যেকের পক্ষে লেডি ম্যাকবেথের চরিত্র বা অ্যালফ্রেড দি গ্রেটের রাজত্বকালের জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক নয়। তুলনামূলক বিশেষণে কোন্ "বিভক্তি" হয় (১৯৪৯ ম্যাট্রিক, বাংলা-২) বা "অন্তর্জলি" কোন্ সমাস (ঐ) তা জানা অত্যাবশ্যক নয়। বিশেষ ক'রে বিশেষণে আদৌ "বিভক্তি" যোগ হয় কি না, তা না জেনেও

যখন ম্যাট্রিকের প্রশ্নকর্তা হওয়া যায়, তখন ছেলেরাও না হয় ঐ বিষয়টিতে অজ্ঞই রইল। অন্তত প্রশ্নকর্তার সমান অজ্ঞতার জন্য ফেল করানো উচিত নয়।

ভেবে দেখা উচিত, দেশের যে অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল, আজ সে অবস্থা নেই। অথচ নতুন পরিবেশে পুরাতন ধারাটি রক্ষা করা যে কত কঠিন তা সবাই বুঝতে পারছেন—বিশ্ববিদ্যালয়ও পারছেন। নতুন ধারা প্রবর্তন করাও হঠাৎ যাবে না। এমনি অবস্থায় পরীক্ষার রীতি পরিবর্তন করা চলে না। পরীক্ষা এখন আরও সহজ করা দরকার, কারণ খাওয়া পরা থেকে শুরু ক'রে সব কিছুর জন্যই প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ে (এবং তাদের অভিভাবক) প্রতিদিন বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হ'তে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি পরিবর্তন করা যায় একমাত্র সহজ এবং উৎসাহজনক প্রশ্নের সাহায্যে এবং এমন প্রশ্নের সাহায্যে যা কোনো নোট বইতে পাওয়া যায় না অথচ পরীক্ষার্থীরা সহজেই নিজের বুদ্ধি থেকে লিখতে পারে। পরীক্ষার্থীরা যদি পরস্পর নকল করতে না পারে তা হ'লে বই খুলতে দেওয়ার রীতিও প্রচলন করা চলে। কারণ যে উত্তর কোনো নোট বইতে পাওয়া যাবে না, যা শুধু নিজের বুদ্ধিতে লেখা যাবে, সে উত্তর লিখতে বই খুলতে দেওয়ায় বাধা নেই। সহজ প্রশ্নের সহজ উত্তর লিখবে নিজের ভাষায়, কে কত সুন্দর লিখতে পারে তার উপর মার্ক দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু একা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এত ছাত্রের জন্য এই আদর্শ শিক্ষা দান এবং পরীক্ষা গ্রহণ রীতি প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। কারণ একই জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এত ছাত্রের ভিড়ই অস্বাভাবিক। যতদিন না ম্যাট্রিকিউলেটদের সম্মুখে বহু বিভিন্ন বিভাগ উন্মুক্ত হচ্ছে ততদিন পাইকেরী হারে ছাত্র পাসের ব্যবস্থাও আগের মতোই রাখতে হবে। হঠাৎ এত ছাত্রকে ফেল করিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কৃতিত্ব প্রমাণ হল না, পরীক্ষার্থীরাও হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না যে যারা পাস করল তারা সবাই শিক্ষার মর্ম বুঝেছে, আর যারা ফেল করল তারা কিছুই বোঝেনি। তারা জানল কঠিন প্রশ্নের দ্বারা তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে,

কারণ সত্যদৃষ্টিতে দেখতে গেলে পাসকরা ছেলেদের অধিকাংশের সঙ্গে তাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে পার্থক্য অতি সামান্য, কারণ যারা পাস করেছে তাদের অধিকাংশ মুখস্থশক্তিতে পাস করেছে, আর যারা ফেল করেছে তাদের অধিকাংশ মুখস্থ শক্তির অভাবে ফেল করেছে। নিজের ভাষায় নিজের বুদ্ধিতে অন্যের (নোট লেখকের) ভাষা ধার না ক'রে যারা উত্তর লিখেছে তাদের সংখ্যা আর পাস করা ছেলেদের সংখ্যা এক নয়। তা ছাড়া যারা পাস করল তাদেরও অধিকাংশ বেকার, যারা ফেল করল তাদেরও অধিকাংশ বেকার। শুধু ফেল-করা ছাত্রদের অন্য কোনো বিভাগে প্রবেশের পথ কিছুটা বন্ধ হল। অবশ্য যারা কিছুই না লিখে ফেল করেছে তাদের কথা স্বতন্ত্র। তারা হয় তো পরীক্ষা ঘরে বই খুলতে দিলেও ফেল করত, কারণ কোথায় খুলতে হবে তা তারা অবশ্যই জানে না। কিন্তু যারা পাস করার আন্তরিক চেষ্টা করেছে অথচ উত্তরগুলো ঠিকমতো মুখস্থ রাখতে পারেনি তাদের অবস্থা শোচনীয়।

সুতরাং পরীক্ষার রীতি পরিবর্তন বর্তমান অবস্থায় কোনো মতেই করা উচিত হবে না, সে জন্য গোড়া থেকে শেষ-পর্যন্ত সকল শিক্ষার পুরাতন ধারা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

(যুগান্তর সাময়িকী, ১৯৪৯)

কি লেখা পড়ব?

বাংলা সাহিত্যে বা সাময়িক পত্রে পঠনীয় কোন্ ধরনের লেখা থাকবে বা বাংলায় পাঠ্য কি আছে এ বিষয়ে আমাকে আলোচনা করতে বলেছেন মাসিক বসুমতী সম্পাদক।

ত্রিশ বছর আগে হ'লে এ আলোচনা খুব সহজেই করা যেত, কিন্তু ইতিমধ্যে ভাল হোক মন্দ হোক, বাংলা সাহিত্য গল্প-উপন্যাসে, জীবনী-সাহিত্যে, ভ্রমণ-কাহিনীতে. সমালোচনা-সাহিত্যে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে এবং বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণামূলক সাহিত্যে এত সমৃদ্ধ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে যে এখন কারও আর সাধ্য নেই যে পঠনীয় বা পঠনযোগ্য বইগুলোর নাম এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করে।

বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্যে বাংলার সাহিত্য-দিগন্ত হঠাৎ অনেকখানি বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। অবশ্য গুণের দিক দিয়ে বা উপযুক্ততার দিক দিয়ে সব বই যে খুব উৎকর্ষ লাভ করেছে তা বলা যায় না। তার কারণ নিজস্ব গবেষণা-বিষয়ক বই, যা একমাত্র ইতিহাস বা ভাষা বা শিল্প বা সংস্কৃতির মধ্যে আবদ্ধ আছে, শুধু সেইগুলোই (মৌলিক গবেষণাজাত হেতু) অন্যান্য প্রবন্ধ পুস্তকের অপেক্ষা মূল্যবান বেশি, কারণ অন্যান্য অনেক বিষয়েই আমাদের নিজস্ব গবেষণামূলক কোনো কৃতিত্ব নেই এবং যদি বা থাকে, যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা বই লেখেন না, অথবা যদি লিখে থাকেন তা নিতান্তই নগণ্য। বিজ্ঞানের অনেক বিভাগই এখনও আমাদের কাছে অগম্য হয়েই আছে, যাঁরা শিশুদের নামে অথবা সাধারণ ভাবে লিখেছেন তাঁরা অনেকেই অনধিকারী, অথবা যাঁরা নির্ভরযোগ্য বই লিখেছেন তাঁরা বিদেশী বই থেকে সঙ্কলন ক'রে লিখেছেন।

বিশ্বভারতী ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ এদিকে প্রশংসাযোগ্য চেষ্টা করেছেন,

কিন্তু তবু সে সব বই আকারে ক্ষীণ এবং তাদের যথেষ্ট প্রচারের ব্যবস্থা হয়নি বলেই মনে হয়।

কেবলমাত্র সঙ্কলন ক'রে যাঁরা লেখেন তাঁদের বই নির্ভরযোগ্য হলেও কৌলীন্যে খাটো। বাংলাদেশে গবেষণা-বিজ্ঞানী আছেন অনেক, তাঁরা যদি গল্পের ভঙ্গিতে নিজ নিজ বিষয়ের সর্বজনপাঠ্য বই লেখেন তা হ'লে দেশের উপকার হবে। ইংরেজী ভাষায় এ রকম অনেক বই আছে। আধুনিক বিজ্ঞানে প্রগতি কত দূর হল, চরম সত্য জানার পথে অগ্রগতির আপাত-সীমারেখা কোথায়, এ সব জানতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বাংলা ভাষায় এ সব আলোচনামূলক কোনো প্রমাণসিদ্ধ বই নেই।

মোটামুটি ভাবে আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে এবং বিজ্ঞানের ছাত্রের বিশ্বরহস্য সম্পর্কে বিস্ময়ের অভাবে বই লেখা হচ্ছে না। ব্যাপক অর্থে সবারই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশে মজার ব্যাপার এই যে যাঁরা সাহিত্য শিল্প ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় একমাত্র তাঁরাই দিয়েছেন বেশি, এবং তাঁদের বই-ই বেশি নির্ভরযোগ্য।

আমাদের ইতিহাস-বোধ প্রায় পুরোপুরিই জেগেছে, কিন্তু ভূগোল-বোধ কিছুমাত্র জেগেছে বলে বোধ হয় না। ইংরেজী ভাষায় অন্তত দু'খানা ভূগোল-বিষয়ক সাময়িক পত্র আছে—ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন ও জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাগাজিন। প্রথমখানা আমেরিকার, দ্বিতীয়খানা ইংল্যাণ্ডের। এই দু'খানা ম্যাগাজিনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন প্রাকৃতিক ভূগোল ও মানবিক ভূগোল সম্পর্কে ঐ সব দেশের মনোযোগ কি স্তরে উঠেছে। এই সব কাগজে একটি লেখাও শুধু পণ্ডিতদের জন্য নয়, সাধারণ পাঠকের জন্যও। এর পটভূমিতে দেখা যাবে তাদের ভৌগোলিক কৌতূহল। পৃথিবীর (এবং আকাশের) ভূগোল তো তারাই রচনা ক'রে চলেছে। আমাদের কি দান আছে ভূগোলে? যে ভূগোল স্কুল-কলেজে পড়ানো হয় তার কোনোটাই আমাদের নিজস্ব গবেষণালব্ধ নয়। এ দেশে যে ভূগোল লেখা হয় তা ওদের লেখা ও ছবি থেকে নিয়ে।

ভূগোল সম্পর্কে এত বলছি এ জন্য যে একমাত্র এথনোলজির ছাত্র ভিন্ন আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, তথ্য সংগ্রহের প্রেরণা নিয়ে, কেউ কোথায়ও ভ্রমণ করেন না, বা এমন ভ্রমণ-কথা লেখেন না যা কোনো স্থান সম্পর্কে প্রামাণ্য বইরূপে গণ্য হ'তে পারে, যা দেশে বা বিদেশে সর্বত্র আদৃত হ'তে পারে। এ পর্যন্ত এ বিষয়ে যে চেষ্টা হয়েছে তা দুর্বলের চেষ্টা, তার মধ্যে সার বিশেষ কিছু নেই। একমাত্র 'কালপেঁচা' এ বিষয়ে প্রথম মনে হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষকেরাই যদি সাহিত্য রচনা করতে পারতেন তাঁদের নিজ নিজ বিষয়ের—অর্থাৎ ইংরেজী ভাষায় হলডেন যেমন করেছেন, হাক্সলি যেমন করেছেন, গ্যামো যেমন করেছেন, জেমস জীনস যেমন করেছেন, তেমন বই আমাদের দেশে কোথায়? আমাদের দেশে জগদীশচন্দ্র বাংলা গদ্যের ওস্তাদ ছিলেন, তিনি ইচ্ছে করলে পারতেন, কিন্তু করেননি। "অব্যক্ত" নামক বইতে কাব্যের প্রাধান্য বেশি। প্রফুল্লচন্দ্র পারতেন, করেননি। তিনি ইংরেজীতে রসায়নের ইতিহাস লিখেছেন এবং শেক্সপীয়ারের নাটক নিয়ে উৎকৃষ্ট গবেষণা করেছেন শেষ বয়সে। বিজ্ঞান হিসাবে রসায়ন, বিশ্ববস্তু-গঠনে যে বিস্ময় মনে জাগায়, তিনি সেই বিস্ময় সঞ্চার করতে পারতেন সাধারণ পাঠকের মনে, সাধারণের পাঠ্য রসায়ন সাহিত্য রচনা ক'রে। বিজ্ঞানের প্রগতি সম্পর্কে তাঁর সময়ের সব দিকের কথা লিখতে পারতেন, কিন্তু তিনি লিখলেন শেক্সপীয়ারের সৌন্দর্য—এবং কবি রবীন্দ্রনাথ লিখলেন বিশ্ব-পরিচয়। পাখী, বিশেষ ক'রে বাংলার পাখী সম্পর্কে, জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে, গাছপালা সম্পর্কে, ঘরে ঘরে পড়বার মতো সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য কোনো বই আছে ব'লে জানি না।

ইংরেজি কোনো বইয়ের দোকানের তালিকা দেখলে আমাদের জ্ঞানের এবং বিভিন্ন বিভাগীয় সাহিত্যের দৈন্য দেখে লজ্জায় মাথা নিচু হয়। যাঁরা পণ্ডিত তাঁদের মধ্যে কারও বই লেখার যদি বাসনা হয় তবে তা যে স্কুল বা কলেজপাঠ্য বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এ কথা বলা বাহুল্য। নিজ নিজ বিষয়ে তাঁরা সৃষ্টির রোমাঞ্চকর বিস্ময় অনুভব করেন না, পাঁচ জনকে ডেকে তাঁদের সেই বিস্ময় প্রকাশ করতে পারেন না, এটি মর্মান্তিক ভাবেই বেদনাদায়ক।

আকাশ-রহস্য সম্পর্কে বাংলা ভাষায় কোনো বই নেই, বিবর্তন সম্পর্কে কোনো বই নেই। আমি সব সময়েই সাধারণ পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির উপযুক্ত বিজ্ঞানীর লেখা বইয়ের কথাই বলছি।

এই জাতীয় সহজপাঠ্য বইয়ের অত্যন্ত প্রয়োজন আছে আমাদের। অবশ্য সব বই-ই প্রকৃত অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির লেখা এবং সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হওয়া চাই।

চাই এই জন্য যে আমাদের দেশে যাঁরা গল্প-উপন্যাস লেখেন তাঁদের এ সব বিষয় কিছু কিছু জানার প্রয়োজন আছে, কাহিনীতে বাস্তবতা এবং বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য। যখন দেখি গল্পে উত্তাপ মাপা হচ্ছে ব্যারোমিটার দিয়ে, শিকার করা বাঘটা দশ হাত দীর্ঘ, ডাক্তার মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে সর্দির জীবাণু দেখছেন, নাইট্রোজেন যৌগিক পদার্থ, কিংবা যখন পড়ি, নাম-না-জানা পাখী, নাম-না-জানা গাছ, তখনই মনে হয় এ সব বিষয়ে সহজপাঠ্য বাংলা বই থাকলে গল্প-লেখকেরা লাভবান হতে পারতেন।

সাময়িক পত্রে এই সব বিষয়ে প্রবন্ধ নিয়মিত লিখিয়ে নেওয়া উচিত অভিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে। এ সবই সাময়িক পত্রের বিষয়। ম্যাগাজিন মাত্রেরই উচিত নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে পাঠককে কৌতূহলী ক'রে তোলা।

বাংলা ভাষায় দেশ-বিদেশ মিলিয়ে একখানা বড় জীবনীকোষ অবিলম্বে ছাপা হওয়া উচিত। রেফারেন্স বই বাংলা ভাষায় নেই বললেই চলে। মাসিক বসুমতীতে বাঙালী লেখকদের জীবনীকোষ সঙ্কলিত হচ্ছে, এর সঙ্গে সকল বিভাগের লোকেরই (দেশী ও বিদেশী) ক্রমশ ছাপা হ'লে ভাল হয়।

বিশেষ কোনো একটি বিষয়ের পত্রিকা বাংলা দেশে চলে না, কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠকেরা উদাসীন। গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় তাই অনেক মনোহর বিষয়ের সঙ্গে মিশেল দিয়ে চালাতে হয়। অনেক গল্প ও ছবির মধ্যে দর্শন-বিজ্ঞান সবই চলে, স্বতন্ত্রভাবে চলে না। ১৭৩১ সালে ইংল্যাণ্ডে আধুনিক ম্যাগাজিনের জন্ম—তার নাম ছিল জেণ্টলম্যান'স্ ম্যাগাজিন। সেই নামই আমাদের দেশের বড় ম্যাগাজিনগুলোর দেওয়া চলে, অর্থাৎ আমাদের দেশে

ম্যাগাজিন চালাতে হ'লে সবগুলোই হওয়া চাই জেণ্টলম্যান'স্ ম্যাগাজিন। শিল্প বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি পৃথকভাবে ভদ্রলোকে পড়ে না। গল্প উপন্যাসের সঙ্গে কোনো রকমে চালিয়ে দিতে হয়।

যে ভাবেই হোক মাসিকপত্রেই আমাদের দেশে পাঠক তৈরি করছে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে। গল্প পড়ার জন্য মাসিক কিনে সে সঙ্গে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক প্রবন্ধও দু'চারটে পড়তে হয় বৈ কি। মাসিকপত্র সে জন্য এমন রচনা চায় যা পড়তে আরাম লাগে। বিষয়বস্তু যত অপরিচিতই হোক, সে বিষয়ে গল্পের ভঙ্গিতে কিছু আলোচনা অবশ্যই করা যায়। রচনা মনোনয়নের সময় সে জন্য স্টাইল এবং ভাষার সরসতা, সরলতা এবং চিন্তার স্বচ্ছতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। ইংরেজী ভাষায় রীডার্স ডাইজেস্ট ও সায়েন্স ডাইজেস্ট নামক দু খানা সঙ্কলন মাসিক আছে, তাতে জ্ঞান বিজ্ঞানের সব বিভাগ নিয়েই ভাল ভাল প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করা হয়। অথচ সবাই তা পড়তে পারে এবং বুঝতে পারে। কাজেই পাঠককে যে-কোনো বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত করাতে হ'লে গল্পের মতো সহজ ভাষাতেই তা করা উচিত। পৃথিবীর যেখানে যা-কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে—যে-কোনো বিষয়েই হোক—সে সম্পর্কে মাসিকপত্রেই প্রথম পরিচয়জনিত আলোচনা থাকা উচিত। এতে পাঠকের কৌতূহল বাড়বে, এতে বাংলা ভাষায় ভবিষ্যতে নানা বিষয়ের বই প্রকাশ করার পথ পরিষ্কার হবে।

যাঁরা গল্প-উপন্যাস লেখেন তাঁদের পক্ষে এখন আর আগের মতো একই স্থানকালে একই ধরনের চরিত্রে আবদ্ধ থাকা চলছে না—বিভিন্ন কর্ম বিভাগের চরিত্র আমদানি না করলে গল্পে বৈচিত্র্য সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে না। তাই বর্তমান জগৎ সম্পর্কে তাঁদের কিছু নির্ভুল প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার। লেখকের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত না হ'লে তাঁর সৃষ্টিও বিচিত্র হ'তে পারে না, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রসীমায় একই ফসল ফলাতে ক্ষেতের উর্বরা-শক্তি স্বভাবতই কমে আসে। তখন নিজেকেই অবিরাম অনুসরণ করতে হয়। মনস্তত্ত্ব যা ফোটানো যায় তা সেন্টিমেণ্টের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে, নতুন নতুন পরিবেশ সৃষ্টির

ক্ষমতা থাকে না, তা ভিন্ন একটি চরিত্রকেও সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করতে শুধু সহানুভূতি নয়, জ্ঞানও থাকা চাই। অথচ আমাদের লেখকদের দৃষ্টিশক্তি আছে, মানুষকে দেখেছেন, চিনেছেন, চরিত্র ফুটিয়ে তোলায় নিপুণতার অভাব নেই, শুধু বৈচিত্র্যের অভাব।

ছোট গল্প মাসিকপত্রের একটি প্রধান অঙ্গ। দু-তিনটি নিয়মিত থাকা চাই-ই। প্রথম শ্রেণীর গল্প পাওয়া কঠিন। এ সমস্যা দেখছি ইংল্যাণ্ডেও আছে। জ্যাক ট্রেভর স্টোরি লিখছেন (জন ও' লণ্ডন'স উইকলি, ১-১-৫৪) যত গল্প আসে তার অর্ধেকই এমন ভঙ্গিতে লেখা যা অনেক দিন বাতিল হয়ে গেছে, একঘেয়ে হয়ে গেছে।

কিন্তু উপায় তো নেই! তা ভিন্ন মাসিকপত্রের গল্পে অনেক সময় যে কিঞ্চিৎ অপরিণত হাতের পরিচয় থাকে তাও এক দিক দিয়ে উপভোগ করা যায়। ছেলেমি ভাল লাগে অনেক সময়। সেই জন্যই সম্ভবত বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক এ. সি. ওয়র্ড বলেছেন Man cannot live by masterpieces alone.

মাসিকপত্রে শিকার-কাহিনী পড়তে আমার ভাল লাগে, অন্তত পড়তে চাই, কিন্তু বড়ই অভাব। মৃত বাঘের ঘাড়ে পা তুলে স্টুডিওতে তোলা শিকারীর ছবি এখন অচল। শিকার সম্পর্কে নানা দিক থেকে অবশ্য লেখা যায়, কিন্তু প্রকৃত শিকার-কাহিনী রচনার একটি আদর্শ আছে। সে হচ্ছে এই যে শিকার সম্পর্কে, বন-জঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞানেরও পরিচয় তাতে থাকবে, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বাদে তথ্য অংশ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হওয়া চাই। তথ্য বাদ দিয়ে নিজের কৃতিত্ব বা বাহাদুরি বাড়িয়ে বলার অভ্যাস বর্জনীয়, প্রকৃত শিকারী কখনো তা করবেন না। অকারণ রোমান্টিক হবার দরকার করে না, যদিও ভদ্র এবং ক্ষমতাশালী শিকারীর লেখায় কিছু পরিমাণ স্বগতোক্তি বা দার্শনিকতা—এমন কি আত্মিক উপলব্ধির প্রকাশও অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু শিকার-কাহিনী প্রামাণ্য দলিল হবে আগে, অন্য সব পরে। অতিশয়োক্তি বা নিহত জন্তুর আকার বাড়িয়ে বলার ইচ্ছা যেন আদৌ না হয়। শিকারীর বা তাঁর পরিবারসুদ্ধ

লোকের ছবি ছাপা সুরুচির পরিচয় নয়। এ বিষয়ে করবেটের কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘেরা বা রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেকো চিতা আদর্শ বলা যেতে পারে। শিকারী অশিকারী সবারই এই চমৎকার বই দুখানি পড়া উচিত।

গল্পের কথা আগেই বলেছি। মাসিকপত্রের অধিকাংশ রচনাতেই যথাসম্ভব গল্পেরই স্বাদ থাকা দরকার। তা নইলে কেউ পড়তে চায় না। কিন্তু গল্পের ক্ষেত্রেও নানা জাতি আছে। ডিটেকটিভ গল্প অনেকে পড়তে ভালবাসে। কিন্তু অন্য দেশের তুলনায় আমাদের ডিটেকটিভ গল্প অধিকাংশই নিচু স্তরের—একেবারে অবাস্তব এবং হাস্যকর। অথচ আধুনিক ডিটেকটিভ গল্প ইংরেজীতে এক অদ্ভুত উৎকর্ষ লাভ করেছে। নামে ডিটেকটিভ গল্প, কিন্তু অনেকগুলি জীবন্ত চরিত্র একসঙ্গে, এমন ধৈর্যের সঙ্গে, এমন সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে আড়াইশ' পৃষ্ঠার এক একখানি বই লেখা কম কৃতিত্বের কথা নয়। চরিত্র-সৃষ্টিতে, প্লটের বাঁধুনিতে, সব রকম স্তরের লোককে রক্ত-মাংসের মানুষ ক'রে গড়ে তোলাতে, অনিবার্য লজিক এবং ঘটনা ও চরিত্র বিশ্লেষণে, কাহিনীগুলি সত্যই বিস্ময়কর। প'ড়ে মনে হয়, আমাদের দেশের আধুনিক বড় গল্প-লেখকেরা অনেকেই শুধু চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়েও এর কাছাকাছি আসতে পারেননি। এ জাতীয় গল্পে অবশ্য সাধারণ ভাবে আমাদের অন্তরের তৃপ্তি নেই (যদিও কোনো কোনো কাহিনীতে তাও আছে) কিন্তু তবু এ কথা মানতেই হবে যে, এই জাতীয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বহু নির্ভুল তথ্যপূর্ণ গল্পেও ওঁরাই চরম উৎকর্ষ দেখিয়েছেন, আমরা শুধু ওঁদের অক্ষম অনুকরণ করছি।

মাসিকপত্রে সমালোচনা বিভাগের উপর আরও জোর দেওয়া দরকার। শুধু পুস্তক সমালোচনা নয়, সকল গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক বিষয়ের সমালোচনা। দায়িত্বপূর্ণ এবং ব্যালান্সড সমালোচনা। ইংরেজী সাময়িক সাহিত্যপত্রে পরিচয় পেয়েছি পুস্তক সমালোচনা বিভাগের দায়িত্ববোধের। সমালোচকেরা অবশ্য এ জন্য যথেষ্ট পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। তাঁদের সমালোচনা প'ড়ে যেমন তৃপ্তি হয় তেমনি শিক্ষাও হয়। একখানা বইয়ের যথাস্থান নির্দেশ এবং মূল্য নিরূপণে তাঁদের যথেষ্ট যত্ন নিতে হয়, প'ড়ে শ্রদ্ধা হয়।

স্থানাভাব না ঘটলে থিয়েটার, সিনেমা এবং রেডিও সমালোচনা নিয়মিত হওয়া দরকার—বিশেষ ক'রে থিয়েটার। অনেকের ধারণা সমালোচনা মানেই গাল দেওয়া। গাল দেওয়ার প্রশ্নই নেই, যদি না গাল খাবার জন্য কেউ প্রস্তুত হয়েই আসরে নামেন। আসল কথা দায়িত্বপূর্ণ সমালোচনায় ব্যক্তিগত কিছু নেই, তার চেহারাই আলাদা। সমালোচনার উদ্দেশ্য সমালোচিতকে শত্রুতে পরিণত করা নয়, তাকে নিজের সুযুক্তিপূর্ণ মতে দীক্ষিত করা। যা সমালোচনার অযোগ্য এমন কোনো বিশেষ বিষয়ে নীরব থাকা ভাল, অথবা দু'কথায় সেরে দেওয়া ভাল, সংক্ষেপে বলে দেওয়া ভাল। কিন্তু সব সময়েই দায়িত্বপূর্ণ উক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। দায়িত্ব জ্ঞান যাঁর আছে একমাত্র তিনিই সমালোচক হবার উপযুক্ত। কারণ তিনিই কথার ওজন রাখতে পারবেন। যে রচনা বা সৃষ্টিতে শিল্পীর মূল উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে তাতে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি যদি থাকে তবে তাকে মূল লক্ষ্য থেকে বড় ক'রে তোলা উচিত নয়, অথচ সাধারণত তাই হয়ে থাকে।

থিয়েটারের সমালোচনা বর্তমানে নেই বললেই চলে, অথচ থিয়েটার বাঙালীর সংস্কৃতির বড় অঙ্গ। সংস্কৃতির দিক দিয়ে বাঙালী আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে তাতে থিয়েটারের দান অস্বীকার করা মানে আত্ম-ইতিহাস অস্বীকার করা। থিয়েটারের কোনো প্রচলিত নাটক সমালোচনার কথাই বলছি না, থিয়েটার সংক্রান্ত ব্যাপক আলোচনার কথা বলছি। এ দেশে থিয়েটারের উন্নতি আরও কি ভাবে হতে পারে, ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে, রাশিয়ায়, কি ভাবে থিয়েটার চলছে, তার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা, আমাদের দেশে যাতে অনেকটা সেই অবস্থা সৃষ্টি করা যেতে পারে তার চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ সমালোচনা গঠনমূলক হওয়া দরকার। নাট্য সমালোচনা ইংরেজীতে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পর্যায়ে উঠেছে অনেক দিন থেকেই। সে দেশে নাট্য সমালোচনার সঙ্কলন গ্রন্থ একাধিক প্রকাশিত হয়েছে। সে সব বই মূল্যবান। আমাদের দেশে কোথায় সমালোচনা? কোথায় নাট্য সমালোচনা সাহিত্য? এখনও এর একটা আরম্ভ দেখতে চাই মাসিকপত্রে।

রাষ্ট্রনৈতিক সমালোচনারও স্থান আছে মাসিকপত্রে। এইখানে সবচেয়ে বেশি দরকার নিরপেক্ষ এবং আবেগহীন হওয়া। কংগ্রেস সম্পূর্ণ জনপ্রিয় হতে পারছে না কেন তার কারণ বিশ্লেষণ করা দরকার। কংগ্রেস জনসাধারণ থেকে দূরে স'রে যাচ্ছে এটি সর্বজনসম্মত সত্য। কংগ্রেসের লোক জনসাধারণের বিপদকালে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় না, এ অভিযোগ সবার মুখে। কংগ্রেসকে তাই এ বিষয়ে নিত্য সচেতন করার দরকার আছে। সমালোচনা তাই কংগ্রেসের এই নিষ্ক্রিয়তাকে দূর করার কাজে নিয়োজিত হওয়া দরকার।

মাসিকপত্রে কৌতুক রচনা ব্যঙ্গ রচনার স্থান আছে, কিন্তু নিয়মিত হাস্যরস সৃষ্টি কোনো একা লোকের পক্ষে সম্ভব ব'লে মনে হয় না। সব খবরের কাগজেই রসাত্মক প্যারাগ্রাফের ফীচার আছে, কিন্তু তার মধ্যে কৌতুক সৃষ্টি নিয়মিত হওয়া সম্ভব নয়, মাঝে মাঝে হয়। সেদিন বসুমতীর 'বাঁকা চোখে'র একটি প্যারাগ্রাফ চমকপ্রদ মনে হয়েছে। লেখক বলেছেন, মানুষ কুকুরকে কামড়াচ্ছে যদি কোথায়ও দেখেন তবে মনে করবেন না সেটা সংবাদ-সৃষ্টির জন্য, আসলে সেটি খাদ্য অভিযানের ব্যাপার। এই জাতীয় হিউমার মনে রাখবার মতো। এ রকম মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, সব সময় নয়। এক জন ইংরেজ কৌতুক-লেখক বলেছেন, অনেক কৌতুক লেখা হয়, কিন্তু সবগুলো জমে না, এবং জমে না ব'লেই ভালগুলোকে আমরা উপভোগ করতে পারি। বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক এ. সি. ওয়র্ড বলেছেন—Since newspapers began to feature deliberately amusing writing...laughter has become professionalized ..It is possible to be funny once a day or once a week, but could anyone guarantee HUMOUR at regular short intervals ?

তাই নিয়মিত হাস্যরসের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্যই কঠিন। মনে হয় বিভিন্ন লেখকের কাছ থেকে মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ বা কৌতুক রচনা লিখিয়ে নিলে ভাল হয়।

স্মৃতিকথা লেখায় উৎসাহিত করা দরকার, নানা বিভাগের লোককে। স্মৃতিকথা সাহিত্যিকেরাই যে বেশি লেখেন তার কারণ লেখা তাঁদের সহজে

আসে। যাঁরা লেখা অভ্যাস করেননি তাঁরা লিখতে সঙ্কুচিত হন। সে জন্য রিপোরটিংএর কাজে যাঁরা পাকা, তাঁদের নিযুক্ত করা উচিত অন্যান্য বিভাগের প্রবীণ কর্মীদের কাছ থেকে স্মৃতিকথা সংগ্রহের কাজে। সামরিক বিভাগের কোনো কর্মীরই কোনো স্মৃতিকথা বাংলা ভাষায় সম্ভবত নেই, এক প্রথম মহাযুদ্ধের বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের মনবাহাদুর সিং-এর বাংলা বইখানা ছাড়া।

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলা উচিত এই যে, আমাদের দেশের নবীন লেখকদের বিদেশী সাময়িকপত্র কতকগুলো নিয়মিত পড়া উচিত। তাতে তাঁরা দুদিক দিয়ে লাভবান হবেন। প্রথমত, জানতে পারবেন ইংরেজী ভাষায় অনেক লেখক আছেন এবং লেখার টেকনীক তাঁদের সকলেরই আয়ত্ত। এ জিনিস সত্যই দেখা উচিত এবং এ নিয়ে চিন্তা করা উচিত। দ্বিতীয়ত, এগুলো নিয়মিত পড়লে ভাল লেখার ইচ্ছা আপনা থেকেই আসবে। যাঁরা সাহিত্য বিষয়ে বা অন্য বিষয়ে সমালোচনা লিখতে চান বা সমালোচনা প'ড়ে কোন্ জাতীয় লেখা ইংরেজী ভাষায় প্রশংসা পায় তা জানতে চান, তাঁদের অন্তত টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট, নিউ স্টেটসম্যান অ্যাণ্ড দি নেশান, প্রভৃতি কাগজ নিয়মিত পড়া উচিত।

পড়লে দেখতে পাবেন ইংরেজ লেখকেরা কত সরল ভাষায় এবং সবচেয়ে বড় কথা, কত সংযত ভাষায়, কেমন চমৎকার সমালোচনা বা আলোচনা লেখেন। তা ভিন্ন এতে ওদেশের গ্রন্থ-জগতের সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটবে, সেটিও কম লাভ নয়। গল্প-উপন্যাস হোক বা যে-কোনো বিষয়ের বই হোক, কোন্ আদর্শ, কোন্ মান, ইংরেজদের দেশে মান্য হয় তা বোঝা যাবে। তাঁরা টেস্টিমোনিয়াল লেখেন না, সমালোচনা লেখেন, অন্তত লিখতে আন্তরিক চেষ্টা করেন। একটা নতুন জগৎ আবিষ্কারের আনন্দ পাওয়া যায় এই সব পড়লে। আমাদের চিন্তাধারাই অত উঁচুতে ওঠেনি মনে হবে! ভাষা, ব্যাকরণ, বানান—কোনো দিকেই ইংরেজ লেখকদের অরাজকতা নেই; লেখার টেকনীক সর্বাঙ্গসুন্দর।

এই কথাটা আমাদের নবীন লেখকদের বার বার ভেবে দেখা উচিত। কোনো বিষয়ে কিছু বলবার ক্ষমতা অনেকেরই আছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত লেখার টেকনীক আয়ত্ত না হচ্ছে ততক্ষণ যেমন-তেমন বানানে বা ভুল শব্দ প্রয়োগে তা প্রকাশ করলেই তাকে সাহিত্য ব'লে মানা যায় না। কোনো রকমে প্লটটা খাড়া করলেই গল্প বা উপন্যাস হয় না। ফুটবল খেলোয়াড় খেলার রীতি অমান্য ক'রে, প্রতিপক্ষের লোকদের লাথি মেরে চিৎ ক'রে ফেলতে ফেলতে এগিয়ে গিয়ে যদি গোল দেন, তা হ'লে তা যেমন ফুটবল খেলা ব'লে কেউ মানবে না, লেখাতেও তাই।

লেখার টেকনীক ব্যাকরণের উপর নির্ভরশীল। ব্যাকরণ শিখতেই হবে লেখক হতে হ'লে। বানান বা শব্দের ব্যবহার যান্ত্রিক কৌশলের পর্যায়ে আনা দরকার, কারণ ওর মধ্যে ব্যক্তিগত রুচি বা স্টাইলের প্রশ্ন নেই। তৎসম শব্দ লেখার একই নিয়ম। আবেগ প্রকাশে বা স্টাইলের খাতিরে শব্দবিন্যাস বদলানো যায়, বর্ণবিন্যাস যায় না। আবেগঘটিত বানান নামক কোনো বস্তু নেই।

লেখার এগুলি হচ্ছে প্রথম শর্ত। এই শর্ত না মানলে অন্য দেশে অন্তত লেখক হওয়া যায় না।

(মাসিক বসুমতী, ১৯৫৪)

থেকেও নেই

(রজক-দর্শন)

থেকেও নেই—মস্তবড় ভাবের কথা এটি, বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে। আমরা যা কিছু নিজের ব'লে জানি—আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব, তাদের সম্পর্কে দার্শনিক বলেন: কিছুই তোমার নয়, ওটা মোহ মাত্র, বিচিত্র সংসার—কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।

শুধু তাই নয়, এমন কথাও দার্শনিক বলেছেন যে এই জীবনটাও আমাদের নয়; বিধাতার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা দুদিনের জন্য সংসারে এসেছি মাত্র—কেন এসেছি, কেন চ'লে যাব, আমরা জানি না। ইংরেজ কবি-দার্শনিকও বলেছেন, মহাকুম্ভকারের চাকায়, মাটির তালে, আমরা রূপ নিচ্ছি; তিনি যে ভাবে গড়ছেন, সেই ভাবেই আমরা গ'ড়ে উঠছি। আর একজন কবি বলেছেন পৃথিবীটা সাময়িক বিশ্রামশালা মাত্র। ভারতীয় দার্শনিক বলেন, কিছুই তোমার সঙ্গে যাবে না। বিদেশী দার্শনিক বলেন, you can't take it with you.

তার অর্থ এই যে তোমার আমার বলতে সংসারে কিছুই নেই। তোমার জীবনটাই যখন তোমার নয়, তখন এটা সেটা তোমার ব'লে যা আঁকড়ে ধ'রে আছে, তা হয় একদিনের জন্য, না হয় তিন দিনের জন্য, না হয় সাতদিনের জন্য। অর্থাৎ হয় তা আর্জেণ্ট, না হয় সেমি-আর্জেণ্ট, না হয় অর্ডিনারি—ঠিক লণ্ড্রির কাপড় ধোয়ার মেয়াদের মতো। অতএব ধোপার সম্পর্কে কাপড় যা, আমাদের সম্পর্কে আমাদের সম্পত্তিও তাই।

এই রজক বা ধোপা-দর্শনই জীবন-দর্শনের প্রতিবিম্ব। বহু সামগ্রী হাতে আসে, এবং কিছুদিন পরে তা হস্তান্তরিত হয়—ব্যবসা মাত্রেরই এটা রীতি। কিন্তু অন্যান্য ব্যবসাতে যে সামগ্রী হাতে আসে তা টাকা দিয়ে কিনতে হয়, অথবা ক্রেডিট দিয়ে। দরকার হ'লে তা ব্যবসায়ী হস্তান্তর নাও করতে পারে। বাণিজ্যের

সামগ্রী থেকে নিজের ইচ্ছামতো কোনো জিনিস সে তার নিজের ব্যবহারের জন্য রেখে দিতে পারে। কিন্তু ধোপার বাণিজ্য-সামগ্রী, অর্থাৎ জামাকাপড়, তা যত লোভনীয় বা মূল্যবান হোক না কেন, তার কোনোটার উপরেই তার স্বত্ব আরোপের স্বাধীনতা নেই। সাময়িকভাবে তার হাতে যা এলো, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার সমস্তই তাকে ছাড়তে হবে, হস্তান্তর করতেই হবে, তাই ধোপার সঙ্গে তার কাপড়ের সম্পর্কটাই হচ্ছে মোহমুদ্গরের চরম শিক্ষা, অর্থাৎ কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।

সাতদিন পর ধোপা যেন অবিন্যস্ত এলোমেলো ভাঁজতুষ্ট সমাজকেই নতুন চেহারায় সুবিন্যস্ত ক'রে সাজিয়ে দেয়। তার সাপ্তাহিক ধোয়া যেন গানের সপ্তস্বরের ধুয়া। আমরা সাতদিন পর পর হারিয়ে যাওয়া সুর বিস্তারের পর সমে ফিরে আসি, ধোপাই আমাদের ফিরিয়ে আনে ঐখানে, প্রতি সোমবারে। নইলে আমাদের সৌন্দর্য বোধ, আমাদের মনের তৃপ্তি, আমাদের সামাজিকতা, সবই সুষমাহীন, ছন্দোহীন হয়ে পড়ত।

সব থেকেও কিছুই নিজের নয়, এটি সম্পূর্ণ ক'রে জানে সকল ব্যবসায়ীর মধ্যে একমাত্র ধোপা। তাই জামাকাপড় সম্পর্কে তার মনে যে ঔদাসীন্য জন্মেছে তা ভাবতে গেলে অদ্ভুত লাগে। কারণ ঠিক এই জাতীয় ঔদাসীন্য আর কোনো ব্যবসায়ীর মনে নেই। আগেই বলেছি না জাগবার কারণ অন্য ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসার সামগ্রী সংগ্রহ করে টাকা দিয়ে। ধোপাকে টাকা খরচ ক'রে কাপড় সংগ্রহ করতে হয় না। বিচিত্র রুচির বিচিত্র ভঙ্গির কাপড় আসে তার হাতে। আসে তার ঘরে, দুদিন বাস করবে ব'লে। অতিথির মতো আসে এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেই চ'লে যায়। যে এলো তাকে যেতেই হবে। তাই কাপড়ের সঙ্গে তার যতই আত্মীয়তা হোক; শক্তি দিয়ে, মনোযোগ দিয়ে, স্পর্শ দিয়ে, তার সঙ্গে যতই অন্তরঙ্গতা সে করুক, তবু কাপড়ের কোনো বিশেষ রূপ তার কাছে সত্য নয়। কাপড়ের মালিকের রূপও তার কাছে অবাস্তব। সে মালিককে জানে শুধু চিহ্নের দ্বারা। এক একটি চিহ্ন বা প্রতীক তার কাছে এক একজন মালিকের রূপ। কখনো

ত্রিভুজ চিহ্ন, কখনো রেখা ও বিন্দু চিহ্ন। রেখা বা ত্রিভুজের সঙ্গে বিন্দুর সংখ্যা বাড়িয়ে কমিয়ে সে প্রতীক সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এই বিভিন্ন চিহ্নের দিকে চাইলে তার নির্দিষ্ট জগতের সকল মানুষকে মনে পড়ে। ধোপার জগৎ তাই অনেকটা অ্যাবস্ট্রাক্ট বা বস্তুবিচ্ছিন্ন নির্বিশেষ গুণের জগৎ। যে জিনিসের সে কারবারী, তা তার নিজের নয়। এ এক অদ্ভুত সম্পর্ক। সে আসে তার ঘরে দিন সাতেকের অতিথি রূপে, যেমন রোগী আসে হাসপাতালে। তাই তার কাপড়ের উপর কোনো ব্যক্তিগত মায়া নেই, মোহ নেই, সে কাপড়টিকে জানে কাপড়ত্বের সাহায্যে, যেমন মালিককে জানে চিহ্নের সাহায্যে। বস্তুবিচ্ছিন্ন নির্বিশেষ গুণের সঙ্গে এদের সহজ পরিচয়। কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণকে দেখে ক-এর ভিতর দিয়ে। এরা দ্বিভুজ মানুষকে দেখে ত্রিভুজের ভিতর দিয়ে। এই প্রতীকধর্ম বা সিম্বলিজম্ আর্টের পর্যায়ে পড়বে কিনা তা অবশ্য আজও ঠিক হয়নি।

ধোপারাই আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা ভব্যতার মূলে। সভ্যতার জন্মক্ষণ থেকে ধোপার আবির্ভাব। হয় তো বা ধোপাই সভ্যতা বা সিভিলাই-জেশনকে ত্বরান্বিত করেছে। সামাজিকতা রাখা সম্ভবই হ'ত না ধোপা না থাকলে। মানুষ কতখানি রুচিবান তার পরিচয় দামী পোষাকে নয়, পরিচ্ছন্ন পোষাকে। এই পরিচ্ছন্নতার মূলে আছে ওদের দান। ওরা মানুষের জাতিভেদ জানে না, শ্রেণীভেদ জানে না, বর্ণভেদ জানে না। কেন না ওদের হাতে সমাজের সাতটি বর্ণ মিলে গিয়ে শাদায় রূপান্তরিত হয়। শুভ্রতার বিধানই ওদের ধর্ম। এই শুভ্রতা মানে অমলিনতা।

ওরা নিজেরা বর্ণ মানে না, কিন্তু মানুষকে নিজ নিজ বর্ণে প্রতিষ্ঠিত করে। ওরা নিজেরা বিলাসী নয়, কিন্তু বিলাসী মানুষের বিলাসিতা ওরা বাড়িয়ে দেয়। বিলাসীর বিলাসবাস ও দরিদ্রের ছিন্নবাস ওদের ঘরে একই সঙ্গে মিলিয়ে থাকে। মূল্যবান পোষাক ওদের হাতে নির্ভয়ে তুলে দেওয়া যায়। কারণ ওদের উপর আমাদের সহজ নির্ভর। লোভী মানুষ জানে ওরা লোভী নয়, অবিশ্বাসী মানুষ ওদের অনায়াসে বিশ্বাস করে।

ওদের যা আছে তা ওদের নয়—অর্থাৎ থেকেও নেই—এটা ওরা সম্ভবত নিজেরা বিশ্বাস করে না। ওটা আমাদেরই ধারণা মাত্র। কারণ কাপড় ওদের ঘরে অবিরাম আসে এবং ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু ঘর কখনো শূন্য থাকে না, কাপড়ের একটা অংশ স্থায়ীভাবে ঘরে থেকে যায়। নদীর স্রোত অবিরাম ব'য়ে গেলেও নদী যেমন থাকে, ফুরিয়ে যায় না ; এখানে-সেখানে মানুষ মারা গেলেও মানবতা যেমন স্থির থাকে ; তেমনি কাপড় ওদের ঘরে অস্থায়ী হ'লেও কোনো দিন ওদের কাপড়ত্ব ফুরিয়ে যায় না।

ধোপাকে রজক বলা হয়। কিন্তু রজক কথাটা এসেছে রঞ্জক থেকে। যারা কাপড়ে রং করে বা ছোপায় এই অর্থে। প্রাচীনকালে ময়লা কাপড় ধোয়ার কাজ যারা করত তাদের বলা হত চৈলধাব বা চেলনির্ণেজক। চেল মানে পরিধেয়—চেল ধোয় যে সে চৈলধাব। নির্ণেজ মানেও ধোয়া।

তারপর মুসলমান রাজত্বে কাপড় ছোপানোর কাজ ইংরেজের হাতে চ'লে যাওয়াতে রজকেরা শুধু ধোয়ার কাজ করতে থাকে। তাই রজক বলতে এখন আর রঞ্জক বোঝায় না, ধোপা বোঝায়।

আজকাল ডায়িং অ্যাণ্ড ক্লীনিং নামে যে সব লণ্ড্রির দোকান খোলা হয়েছে, ওরাই এখন রজকের এবং ধোপার কাজ এক সঙ্গে করছে। তাই ধোপার বাণিজ্য-সামগ্রী যেমন তাদের থেকেও নেই, আমাদের কাছে তেমনি ধোপাও থেকেও নেই হয়ে উঠেছে। আমরা দেখি লণ্ড্রি অফিসের লোককে, ধোপারা থাকে নেপথ্যে। কিন্তু থেকেও নেই, এর একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে আমাদের ধোপা। সে ছোট্ট একটি ছেলে—গায়ে বেশ শক্তি। দৈর্ঘ্য তার সাড়ে তিন ফুটের বেশি নয়। সে যখন কাপড়ের প্রকাণ্ড বোঝা মাথায় নিয়ে পথ চলে, তখন মনে হয় বোঝাটা নিজেই চলছে, তার নিচের ছেলেটিকে আর দেখা যায় না। অর্থাৎ সে যেন থেকেও নেই।

(বেতার জগৎ, ১৯৫৩)

পল্লীসমাজ

পল্লীসমাজকে শরৎচন্দ্র সত্যই দেখেছিলেন। তাঁর দেখা পল্লীসমাজের প্রত্যেকটি অংশের সঙ্গে যাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় আছে, তিনিই একথা স্বীকার করবেন যে তাঁর পল্লীসমাজের লোকেরা তাদের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে বাস্তব রূপ গ্রহণ করেছে।

পল্লীর মানুষকে তিনি নানাভাবে দেখেছেন, নিজেকেও পল্লীসমাজের পট-ভূমিতে দেখেছেন, কিন্তু এই কাহিনীতে তিনি একান্তভাবে পল্লীসমাজকেই পুরোপুরি দেখবার চেষ্টা করেছেন। মানুষের ট্রাজেডিতে তিনি বিচলিত হয়েছেন বারবার, কিন্তু পল্লী-সমাজের ট্রাজেডিতে বিচলিত হওয়ার এমন দৃষ্টান্ত তাঁর আর কোনো বইতে নেই। এর চরিত্রগুলি তাই শুধু কুঁয়াপুরের নয়, সকল পল্লীসমাজের পটভূমিতেই সত্য। বেণী ঘোষাল, মাসী, ভৈরব আচার্য্য গোবিন্দ গাঙ্গুলী, ধর্মদাস, আকবর প্রভৃতি মানুষকে সকল গ্রামেই দেখা যাবে। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ সর্বত্র। এরা বিশেষ লোক হয়েও নির্বিশেষ। শুধু বিশ্বেশ্বরী একটি বিশেষ চরিত্র, স্বতন্ত্র, কিন্তু তবু পল্লীপটভূমিতে তিনিও বাস্তব। শুধু রমা পল্লীসমাজে সম্পূর্ণ বাস্তব নয়। সে এত স্বতন্ত্র যে পল্লীসমাজে তাকে ঠিক যেন মানায় না। মানুষ হিসাবে হয় তো বা তার দেখা সর্বত্র পাওয়া যাবে, কিন্তু যেখানেই সে থাক সেখানেই তার মানসিক সত্তা একটু দুর্বোধ্য।

সাধারণতঃ মানুষের মনের দুই বিপরীত দিক পরস্পর খানিকটা মিশে থাকে, কিন্তু রমা যেন সম্পূর্ণ পৃথক দুই ব্যক্তি। মনোবিশ্লেষণে এর অনেকখানি ব্যাখ্যা মিলবে অবশ্যই, চরিত্র হিসাবেও জীবন্ত, কিন্তু তবু পৃথক পূর্বপরিচয়ের অভাবে অস্বাভাবিক। শরৎচন্দ্র একে বিনা কৈফিয়তে রমেশের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছেন, এটা ঠিক হয় নি। বেণী ঘোষালকে পল্লীসমাজের পটভূমিতে দেখলেই চেনা যায়। রমেশকে চেনা যেত না কিন্তু তার পরিচয় আগেই দেওয়া হয়ে গেছে, সে শিক্ষিত, বিদেশে থাকত। কিন্তু রমার পরিচয় কি? পল্লী সমাজের পটে এই রমাকে চেনা যায় না। কিন্তু অন্যত্রও কি তাকে চেনা যেত?

পল্লী সমাজের লোকেরা তার নিন্দা করছে মনুষ্যত্বের বিচারে নয়, সামাজিক বিচারে। শহরের সমাজে থাকলেও তার নিন্দা হ'ত, কিন্তু তা শহুরে সমাজের বিচারে অবশ্যই নয়। নিন্দা হ'ত তার দুর্বোধ্য ব্যবহারে।

হ্যামলেট যখন দুর্বোধ্য হয়েছে তখন তাকে পাগল বলে চিনিয়ে দেবার লোক ছিল, যদিও বুদ্ধিমানের মতে there was method in his madness. কিং লিয়ারের 'পাগলা'কে শেক্স্পীয়ারই ফুল নামে পরিচিত করিয়েছেন, টাচ্স্টোনকে ক্লাউন রূপে পরিচিত করিয়েছেন, তবে তারা তাদের পটভূমিতে সত্য হয়েছে। শরৎচন্দ্র রমার যে পরিচয় দিয়েছেন তা সাধারণ মেয়ের পরিচয়, সেইজন্যই রমা পল্লীসমাজে অবাস্তব। তার চরিত্র সম্পর্কে একটুখানি পূর্ব পরিচয় দিলেই সে সত্য হ'ত। তার দ্বিমুখী ব্যবহারের যেটুকু সমর্থন আছে তা অত্যন্ত দুর্বল। শরৎচন্দ্রের নিজের মনেও রমা চরিত্র খুব স্পষ্ট এবং পরিষ্কার নয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও পল্লীসমাজে শরৎচন্দ্র যা দেখাতে চেয়েছেন তা আমরা দেখেছি। তিনি এখানে এক বা একাধিক ব্যক্তি-চরিত্রকে দেখাতে চান নি, তিনি সমাজকে দেখাতে চেয়েছেন, সমাজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন, এবং তাতে তিনি আশ্চর্য সাফল্যলাভ করেছেন। সমস্ত সমাজটিকে যখন দেখি, তখন রমাকে আমরা অগ্রাহ্য করি।

রমেশ এই সমাজে কেন বেমানান হ'ল, কেন সে এ সমাজকে কিছু দিতে পারল না, তার আভাস শরৎচন্দ্র দিয়েছেন, এবং চিন্তাশীলের মতোই দিয়েছেন। এ সমাজকে উন্নত করতে হ'লে কয়েকটা নির্দিষ্ট ধাপ পার হ'তে হবে, বাইরে থেকে এসে, সমাজের একজন না হয়ে কিছুই করা যাবে না।

বাংলার পল্লীসমাজের এমন সমগ্র রূপ আর কোথায়ও দেখি নি। পল্লী-সমাজের এই রূপ শরৎচন্দ্রের মনে জ্বালা ধরিয়েছে, এ সমাজ ভাঙতে হবে এই তাঁর পণ, তাই তিনি এমন আন্তরিকতার সঙ্গে, সহানুভূতির সঙ্গে, এর স্বরূপ চিত্রিত করেছেন, কোথায়ও হিংসা প্রকাশ করেন নি, উত্তেজনা প্রকাশ করেন নি। পল্লীসমাজ-কাহিনীর নির্দিষ্টক্ষেত্রে তিনি তাঁর সমস্ত সহানুভূতি ঢেলে

দিয়ে শিল্পীর একটি বড় কর্তব্যই পালন করেছেন। এর প্রয়োজন ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ শুকিয়ে শুকিয়ে মরলে তার ফোটোচিত্র প্রকাশ করার সার্থকতা আছে। তাতে লোকে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা সহজে বুঝতে পারে। পল্লীসমাজও ঘুণ ধরা সমাজের ফোটোচিত্র।

কিন্তু তথাপি একথা স্বীকার করতে হবে, পল্লীসমাজের সংস্কার আদর্শ খুব মহৎ নয়। মহৎ হতে হ'লে লেখকের দৃষ্টি আরও উর্ধ্বে প্রসারিত হওয়ার দরকার ছিল। সংস্কারক হিসাবে রমেশের যে রূপটি তিনি পেতে চেয়েছেন—অর্থাৎ পল্লীর একজন রূপে, ঠিক সেই রূপেই ভবিষ্যতে রমেশ যদি ঐ সমাজে এসে মেশে, তা হলে পল্লীসমাজই যে তাকে দীক্ষা দিয়ে ছোটলোক বানিয়ে ছাড়বে। দেখা যাবে রমেশ তাদের সঙ্গে যথারীতি মামলা মোকদ্দমা চালাচ্ছে। ব্যক্তি গান্ধী যা পারে নি ব্যক্তি রমেশও তা পারবে না। তাই গান্ধীজি বুঝতে পেরেছিলেন এই রূপান্তর একমাত্র রাষ্ট্রের হাতেই সম্ভব। শরৎচন্দ্র ততখানি প্র্যাকটিক্যাল হতে পারেন নি। ব্যক্তিগতভাবে একটা স্কুল গড়া যায়, একটি হাসপাতাল গড়া যায়, কিন্তু মানুষের চরিত্র বদলাবে কিসে? পল্লী তো একমাত্র কুঁয়াপুকুর নয়। সুতরাং ব্যাধির মূলে পৌঁছানো দরকার। সমস্ত গান্ধীবাদ সেই মূলে পৌঁছানোর চেষ্টা মাত্র। গান্ধীজি অবশ্য এজন্য উপন্যাস লেখেন নি।

শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি অব্যবহিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। তা ভিন্ন পল্লী-সমাজই তো একমাত্র সমাজ নয়। শহুরে সমাজ যে তার চেয়েও বিকৃত। কোন্ রমেশ এখানে মাথা তুলবে? একটাকে বাদ দিয়ে আর একটার কিছুই করা যায় না। সেইজন্যই 'পল্লীসমাজ' অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত উচ্চশ্রেণীর একখানি ফোটোচিত্রের সমগোত্র ফোটোগ্রাফ মাত্র।

কিন্তু তবু পল্লীসমাজের সেই মূল্যের জোরেই তার অস্তিত্বকে বাংলা-সাহিত্যে আশ্চর্যরূপে সার্থক ক'রে তুলেছে।

(শরৎস্মরণিকা, ১৯৫২)

শেষ